

১৫৪৩ সালটি কেবলমাত্র কোপার্নিকাসের মৃত্যুর বছর নয়, তাঁর বইয়ের জন্মেরও বছর। যখন তিনি একটি পাথরের পাটাতনের নিচে নিশ্চল হয়ে শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর বই চারিদিকে সফর করতে শুরু করেছিল।

কেউ কেউ বইটিকে উপহাস করল, কেউ কেউ প্রশংসা করল। কিন্তু কেউই নির্বিকার থাকতে পারল না। বইটি বদলায়নি, কিন্তু বইটি হাতে আসার পরে তার অনেক পাঠকই একেবারে বদলে গেল।

বইটি, এই বিপজ্জনক বইটি, তাদের কাছে এল নিয়তির মতো, ভবিষ্যতের মতো। যারা ঘূমন্ত তাদের জাগিয়ে তুলল, এমনকি যারা দুর্বলচিন্তা তাদেরও টেনে নিয়ে গেল দৃঃসাহসী অবিশ্বাসী চিন্তার দিকে। গির্জার হৃকুম মতো নয়, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা — তাতে কতই না আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দের জন্যে মাঝে মাঝে দামও দিতে হয় বড় বেশি।

কোপার্নিকাসের বই একজন তরুণ সন্ন্যাসীর হাতে পড়ল। তিনি থাকেন নেপলস-এর অদূরে একটি ছোট শহরে। তাঁর নাম জিওর্দানো ব্রনো। নিজের প্রকোষ্ঠে অনেক বই আছে তাঁর — কতকগুলো বইয়ের তাকে, কতকগুলো অনুসন্ধানী চোখ থেকে আড়াল করার জন্য লুকানো অবস্থায়।

মঠাধ্যক্ষ যদি কখনও সন্ন্যাসী জিওর্দানোর প্রকোষ্ঠে তন্ম তন্ম তপ্লাশি চালান তাহলে তাঁর হাতে আসবে শুধু অ্যারিস্টটল নয় — অ্যারিস্টটল তো গির্জার মঙ্গুরপ্রাপ্ত — উপরন্তু হাতে আসবে স্বাধীন মতাবলম্বী রোমান লুক্রেটিয়াস-এর কবিতা ‘দে রেরম নাচুরা’ যা বস্তুর ধর্ম বিষয়ে লেখা। হাতে আসবে ‘দেবদুতোপম ডাক্তার’ টমাস অ্যাকুইনাস-এর আঠারোটি নথি এবং সেই সঙ্গে রোটারডাম-এর ইরেসমাস রচিত বিপজ্জনক পুস্তিকা ‘মূর্খতার প্রশংস্তি’।

তোশকের নিচে বা মেঝের কোনো একটা পাটাতনের নিচে তপ্লাশি চালালে মঠাধ্যক্ষের হাতে আসবে ব্রনোর নিজস্ব নোটবই। প্রথম নোটবইটি খুলে যদি তিনি দেখেন তাহলে ক্রোধে ও ঘৃণায় নীল হয়ে উঠবেন।

তাঁর লেখা কমেডি ‘আলোকবর্তিকা’, কথোপকথনমূলক রচনা ‘বীর উৎসাহীবৃন্দ’-তে তীব্র উপহাসের বিষয় হয়েছে পবিত্র অঙ্গতা, একনিষ্ঠ নিরুদ্ধিতা, ধর্মের মুখোশধারী পাপ। ভাবা যায় যে এইসব লিখেছেন ডোমিনিকান ভেকধারী এক সন্ন্যাসী! তাহলে কেন তিনি সন্ন্যাসীর আলখাল্লা পরে থাকেন?

বাস্তবিক পক্ষে এই তরুণ-মতাবলম্বী আদৌ কেন সন্ধ্যাসী হয়েছেন?



নিকোলাস কোপার্নিকাস
(১৪৭৩ - ১৫৪৩)

সেন্ট ডোমিনিকের মঠে যখন তিনি যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনেরো। ডোমিনিকানদের সম্পর্কে বহুকাল ধরে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে তারা ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া ও উগ্র এবং অবিশ্বাসীদের কাছে আতঙ্ক। এমনটি হওয়ার কারণ, পোপের বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার জন্যে যে বিচার-সভা বসত (ইন্কুইজিশন) তার সভাপতিমণ্ডলির আসনে ডোমিনিকানদের হান ছিল। ডোমিনিকানদের পতাকায় দেখা যেত একটি কুকুরের মাথা, তার দাঁতে একটি জুলস্ত মশাল। প্রভুর অনুগত খাঁটি শিকারী কুকুরের মতো তারাও সর্বত্র অবিশ্বাসীদের সন্ধান করে বেড়াত। সন্ধ্যাসীদের মধ্যে তারাই ছিল সবচেয়ে বিদ্঵ান। অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য যুক্তিজাল বিস্তার করে তারা অবিশ্বাসী চিন্তাকে উদ্ঘাটন করতে পারত। ‘দেবদূতোপম ডাক্তার’ অ্যাকুইনাস তাদের

ভেকধারী। তিনিই তৈরি করেছেন ‘সুমা থিওলজিয়া’, যা থেকে এক প্রজন্মেরও অধিক ডোমিনিকান শিক্ষালাভ করেছে কী-ভাবে চিন্তা করা উচিত এবং কী-ভাবে চিন্তা করা উচিত নয়। আর এখানেই এসেছিল সেই পনেরো বছরের বালক আরও জ্ঞানলাভ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সেন্ট ডোমিনিকের সেই মঠেই যোগ দিয়েছিল যেখানে একসময়ে টমাস অ্যাকুইনাস শিক্ষাদান করতেন। বালকটি বই ভালোবাসত। মঠের গ্রন্থাগারে যত প্রচুর বই রয়েছে তার চেয়ে বেশি আর কোথায় থাকতে পারে?

বালকটি তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিজ্ঞানের জন্যে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তার বিশ্বাস ছিল — বিজ্ঞানকে, তার সুন্দরী কল্যাকে, সে খুঁজে পাবে মঠের ওই উঁচু পঁচিলের পিছনে। হাঁ, কল্যা ওখানেই আছে। কল্যাকে প্রথম নিয়ে আসা হয়েছিল অমায়িক বৃন্দ ক্যাসিওডেরাসের কক্ষে (ক্যাসিওডেরাস ষষ্ঠ শতাব্দীর রোমান রাষ্ট্রনেতা ও গ্রন্থকার), তারপর থেকে সে মঠ থেকে মঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কৃনো ভেবেছিল, এখানকার শাস্তি পরিবেশ কল্যার কাছে আরো ভালো লাগবে। কিন্তু কী পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে এই সুন্দরী কল্যা। এই সেই কল্যা যে একসময়ে হেলাসের (অর্থাৎ গ্রিসের) পাহাড়ে ও উপত্যকায় তার ভগিনীদের নিয়ে আগুয়ান হয়ে নাচগান করেছিল! সে হয়ে উঠেছিল সিন্ডেরেলা — তার ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী কর্তীর কাছে কর্মরতা দাসী। এখানে ঘন্টার শব্দ ও প্রার্থনার ধ্বনির মধ্যে কল্যার গলার স্বর বড় একটা শোনা যেত না। তার জন্যে ছিল কঠোর উপদেষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক। স্বয়ং ডাঃ টমাস অ্যাকুইনাস তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন:

“তোমার কর্তীর সামনে মাথা নত করো, কেন না মানুষের বোধি মহান ঐশ্ব প্রজ্ঞার চেয়ে কম। এই চৌকাঠ ডিঙিও না, এই পঁচিলের বাইরে যেও না, কেন না মানুষের

বুদ্ধিবৃত্তি সীমাবদ্ধ। মানুষ সব কিছু অবলোকন করতে পারত না। যদি তুমি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করো, যদি তুমি তোমার স্বাধীনতা ফিরে পেতে চাও, তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অবিশ্বাসীদের দণ্ড মৃত্যু।...”

এখানেই এসেছিলেন জিওর্দানো ক্রনো, চার দেওয়ালে ঘেরা ছিলেন। এই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কেন তিনি এসেছিলেন? কেন থাকতে পারলেন না বাইরের জগতের উল্লাস ও আমোদ-আহুদের মধ্যে? একজন যোদ্ধা ও কবির পুত্র হয়ে কেন তিনি সম্ম্যাসী হতে গেলেন? মঠে তিনি এসেছিলেন সেই কন্যার জন্যে — বিজ্ঞানের জন্যে।

তাঁর প্রয়োজন ছিল নিজের চোখ দিয়ে যতদূর দেখা যায় তার চেয়েও বেশি দূর পর্যন্ত দেখার। বিজ্ঞান তাঁকে নতুন দৃষ্টি দিক, তাঁকে দেখতে শেখাক যা অন্য কেউ দেখেনি। আর বিজ্ঞান রয়েছে এই মঠে, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত হাজার হাজার বইয়ে ঠাসা এই গ্রন্থাগারে।...

বছরের পর বছর কেটে গেল। ক্রনো একটির পর একটি বই পড়ে ফেললেন। নড়বড়ে মই বেয়ে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত পৌছে গেলেন সবচেয়ে উঁচু ধাপটিতে। সেখানে পেয়ে গেলেন ধুলোমাখা একটি বই, যেটি বহুকাল অন্য কেউ হাতে নেয়নি।

গ্রন্থাগারে দীর্ঘ সময় কাটাতে গিয়ে তিনি পার হয়ে গেলেন শতাব্দের পর শতাব্দ, দেশের পর দেশ। মনুষ্যবসতির সম্পূর্ণ যাত্রাটি চিহ্নিত করলেন। গ্রিসের দার্শনিকরা তাঁকে নিয়ে গেলেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের পথে, বিশ্বের সীমানাকে ক্রমেই বাড়িয়ে তুলে। গ্রিকদের পথ ধরে এলেন আরব ও ইহুদিরা। আভেরোয়েজ (দ্বাদশ শতাব্দের আরব দার্শনিক ও বৈদ্য) তাঁকে জানালেন যে এই বিশ্ব শাশ্বত, মনুষ্যজাতির মহাসাগরে আত্মা একটি বিলু মাত্র। মানুষ নশ্বর, মনুষ্যজাতি অবিনশ্বর।

ক্যাথলিক গির্জার ফাদারদের তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। স্বচ্ছ গ্রিক জ্ঞানের পরে তিমিরাচ্ছন্ন এইসব “দেবদূতোপম”, “অতি মহান”, “উত্তম”, “অখণ্ডনীয়” উচ্চাসীনদের শিক্ষা! কুয়াশা আরও গাঢ় হয়ে এল। সীমানা ক্রমেই আরও ছোট হতে লাগল। সারা বিশ্ব অশরীরী আত্মায় পরিপূর্ণ — ওপরে দেবদূতরা, নিচে শয়তানরা। দেবদূতরা আকাশের গোলকগুলোকে ঘোরায়, শয়তানরা পাঠায় ঝড়। তাহলে মানুষ কোথায়? এই সমস্ত গোপন শক্তি, এই সমস্ত উজ্জীয়মান আত্মার সংঘর্ষে তার মন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

টমাস অ্যাকুইনাসকে পাশে সরিয়ে রেখে তিনি আবার ডুবে গেলেন প্রাচীন মনীয়ীদের রচনাবলির মধ্যে। অধ্যয়ন করলেন আরিস্টটল। কিন্তু পেলেন না সেই জীবন্ত আরিস্টটলকে — যিনি সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন, পথ হারাতেন, আবার পথ খুঁজে পেতেন। দেবদূতোপম ডাঙ্গার শত শত প্রশ্ন, উপপ্রশ্ন ও ভাববিভাগ ভুলে এমনকি আরিস্টটলকেও শুল্ক প্রস্তরীভূত প্রত্ববস্ত্ব করে তুলেছেন।

কত সংকীর্ণই না মনে হয় আরিস্টটলের বিশ্বকে। ক্ষিতি পরিবর্তিত হয় অপ-এ, অপ-মরণ-এ, মরণ-তেজ-এ, তেজ যোম-এ। ব্যস, এই নিয়েই সব কিছু! শেষ স্বর্গীয় গোলকটি তারাখচিত। তার বাইরে আর কিছু নেই — না প্রাণ, না অন্য কোনো বিশ্ব।...

নিজের প্রকোষ্ঠে ঝনোর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দেয়ালগুলো চারপাশ থেকে তাঁকে চেপে ধরেছে। তিনি এসেছিলেন সুন্দরী কন্যা বিজ্ঞানের সন্ধানে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, সেই সুন্দরী কন্যাও কারাগারে জীবনপাত করছে।

দিনে দিনে মঠের বাতাসে নিষ্পাস নেওয়াটাও ঝনোর কাছে কষ্টকর হয়ে উঠল। কষ্টকর হয়ে উঠল জপমালা হাতে ধরার দৃশ্য। আকাশের দিকে চোখ তোলা অথচ আকাশ না-দেখার দৃশ্য। তাঁর মনে হতে লাগল মঠের মধ্যে তিনি যেন একেবারে বাইরের লোক। আর মঠের সন্ধ্যাসীরাও তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

একজন যাজক প্রধান যাজকের কাছে যাজক জিওর্দানোর নামে এই বলে নিন্দা করল যে যাজক জিওর্দানো পবিত্র ভার্জিনের (কুমারী) সপ্ত আনন্দ নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। আরও একজন এসে জানাল যে জিওর্দানো যা করেছে — কথাটা মুখে আনলেও পাপ হয় — নিজের প্রকোষ্ঠ থেকে সাধুদের মূর্তিগুলি বার করে দিয়েছে আর শুধু ক্রুশ রেখে দিয়েছে।

জিওর্দানোকে অবিশ্বাসী বলে সন্দেহ করা হতে লাগল। কড়া নজর রাখা হল তার ওপরে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলল না। যথাসময়ে তিনি খ্রিস্টান পুরোহিত হলেন। তখন খ্রিস্টের ভজনা গাইলেন। শিশুদের দীক্ষিত করলেন, শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

মঠ ছেড়ে তাঁকে প্রায়ই নেপলস-এ যেতে হত। স্বাধীনতার এই ছায়াটুকু তিনি আগ্রহের সঙ্গে কাজে লাগাতেন। বিদ্ধি ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতেন। নিষিদ্ধ বই সংগ্রহ করতেন।

আর ঠিক এই সময়েই কোপার্নিকাসের বইটি তাঁর হাতে এসে পড়ল। কী আনন্দের সঙ্গে তিনি আবিষ্কার করলেন তার চোখের সামনে নভোমণ্ডল উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারাগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে অসীমের মধ্যে। এই তারাগুলির মধ্যে পৃথিবী এক উদ্ভাসিত বিন্দুমাত্র। প্রাচীন পৃথিবী ছিল উপর ও নিচে থেকে চাপা অবস্থায় — উপরে স্বর্গের শিখর, নিচে নরকের গহুর। এখন এই ক্লিষ্ট ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিকে সীমাহীন অন্তরীক্ষ, সেখানে কত সহজে নিষ্পাস নেওয়া যাচ্ছে। আর পৃথিবী যেন একটা পাখি, সহগামী গ্রহগুলকে নিয়ে স্বর্গীয় অন্তরীক্ষে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আগ্রহের সঙ্গে ঝনো কোপার্নিকাসের চিত্র অধ্যয়ন করলেন। সূর্য রয়েছে কেন্দ্রে। আর সূর্যের চারিদিকে, অনেকটা দূরে, রয়েছে নক্ষত্রদের গোলক।

কোপার্নিকাস বিশ্বের প্রাচীর সরিয়ে দিয়েছেন বাইরের নক্ষত্রদের দিকে। কিন্তু ভিরুর মতো সেখানেই থেকে গিয়েছেন। তিনি থেমে গেলেন কেন, কেন ভাবলেন যে নক্ষত্র ছাড়িয়ে আর কিছু নেই? আরিস্টটলের শিক্ষা তাই — এই কারণেই কি? কিন্তু ডিমোক্রিটাস, এপিকিউরাস ও লুক্রেটিয়াস তো এই শিক্ষা দিয়েছেন যে বিশ্ব অসীম আর সেখানে কত যে জগৎ আছে তা কেউ জানে না।

ঝনোর মনে হতে লাগল এই শেষ প্রাচীর ভেঙে ফেলাটাই তাঁর কর্তব্য, এজনেই তিনি নিয়ন্ত্রণ। নিজেকেই নিজে বললেন, “বিশ্বাসজনক যুক্তি খুঁজে বার কর! অমিত বিক্রিমে এই শেষ অচলায়তন প্রাচীর ভেঙে ফেল, ধূলিসাঁ কর! মানুষকে বোঝাও যে জগৎ আছে মাত্র একটি নয়, অসংখ্য! দুয়ার খুলে দাও যাতে সবাই দেখতে পায় আমাদের সূর্যের মতো আরো নক্ষত্র রয়েছে।

আর তখন জগতের প্রাচীর ও মঠের প্রাচীর অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিকে সীমাহীন অস্তরীক্ষ। যেদিকেই তাকানো যাক, দেখা যাচ্ছে সংখ্যাতীত নক্ষত্র। সেইসব নক্ষত্রের চারিদিকে গ্রহগুল আবর্তিত হচ্ছে। সেইসব গ্রহে বাস করছে জীবন্ত প্রাণী। তারা আমাদের সম্পর্কে জানে না, যেমন আমরা জানি না তাদের সম্পর্কে।

তাঁর সামনে উমোচিত এই বিপুল বিশ্বের দিকে ঝুনো তাকিয়ে দেখলেন। এখনই মনে হচ্ছে চারিদিকের এত নক্ষত্রের মধ্যে তাঁর স্বদেশ পৃথিবীকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এটি এখন কোনো রকমে চোখে পড়ার মতো একটি বিন্দু মাত্র — মহাশূন্যে বিকমিক করছে।

এই বিশ্বের সঙ্গে তুলনায় মানুষ তাহলে কতটুকু? কিছুই নয়? না, মানুষ এই অসীমকে চিনতে পেরেছে, এক পলক তাকিয়েই তাকে ধরতে পেরেছে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তাকে বুঝতে পেরেছে।

মহা আনন্দে ঝুনো পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। অনুভব করলেন মনের প্রসার। তাঁর আত্মা দুই অনন্তের মাঝখানে ভেসে বেড়াতে লাগল — একদিকে বৃহৎ বস্ত্র জগৎ, অন্যদিকে ক্ষুদ্র বস্ত্র জগৎ; একদিকে নক্ষত্রের জগৎ, অন্যদিকে পরমাণুর জগৎ।

ঝুনোর নিশ্চিত ধারণা হল পৃথিবীতে তাঁর ঠাই নেই

তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু পৃথিবীতেই আছেন — নেপলস-এ একটি মঠের প্রকোষ্ঠে। ঝুনো যখন অনন্তে ভাসছিলেন তখনও তাঁর ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখা হচ্ছিল। তিনি কী বলছিলেন সেটা তারা শুনছিল। শুধু তাই নয়, তিনি কী ভাবছিলেন তাও তারা জেনে নিছিল। তাঁর বিরক্তে একশ ত্রিশটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। একশ ত্রিশবার তিনি ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষা অমান্য করেছিলেন।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি নেপলস থেকে রোমে চলে গেলেন। কিন্তু মঠের সাধুরা তাঁর প্রকোষ্ঠে তল্লাশি চালিয়ে তাদের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ পেয়ে গিয়েছিল। সেটি একটি বই — রোটারডামের ইরাসমাস রচিত। তাড়াতাড়িতে বইটি তিনি ফেলে গিয়েছিলেন।

ঝুনো তখন সাধুর আলখাল্লা ছেড়ে দিয়ে টুপি ও পিরান গায়ে দিলেন। কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলিয়ে দিলেন একটা তলোয়ার। সাধু সন্ধ্যাসীদের পোশাকের চেয়ে এই জাগতিক পোশাকটাই তাঁকে যেন আরো বেশি মানিয়ে গেল।

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ক্লপকথার রাজপুত্র, সিঙ্গেরেলাকে উদ্বার করতে এসেছেন। তিনি চলে গেলেন বন্দরে, একটি জাহাজে চেপে বসলেন। সমুদ্রের তাজা বাতাস তাঁর মুখের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তাঁর সামনে স্বাধীনতা।

এমনিভাবে তিনি নগরে-নগরে ও দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জগৎটাকে এমনিতে বড় মনে হতে পারে, কিন্তু ঝুনোর কাছে ছিল খুবই ছোট।

তিনি ভেবেছিলেন, আলপস-এর ওপারে স্বাধীন সুইজারল্যান্ডে নিজের জন্যে ও ভ্রমণ-সঙ্গী বিজ্ঞানের জন্যে আশ্রয় পেয়ে যাবেন। খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুদের লম্বা হাত ওখানে নিশ্চয়ই পৌছতে পারবে না।

ବ୍ରନୋ ଜେନେଭାତେ ଗେଲେନ । ଆନନ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ବାତାସେ ନିଶ୍ଚାସ ନିଲେନ । କିନ୍ତୁ କିଛୁଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ବୁଝାତେ ପାରଲେନ, ତିନି ମିଥ୍ୟା ଆଶା ପୋଷଣ କରେଛେ । ଏଖାନକାର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ରୋମ ଥେକେ ଆଲାଦା, କିନ୍ତୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏକଇ ରକମେର । ଚାରଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ଆହେ ମଠେର ସାଧୁ ନଯ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନଦାର । ଏଖାନକାର ଧର୍ମ ସମ୍ବ୍ୟାସୀର ନଯ, କାରବାରିର । ଯାର ଧନ ଆହେ ସେ-ଇ ଧାର୍ମିକ । ଅଥଚ ଗୌଡ଼ାମି ଆହେ ଏକଇ ରକମେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ।

ତାରା ଯଥନ ତାର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲିଲ, ବ୍ରନୋ ତାଦେର ଚୋଥେ ଦେଖିଲେନ ଉଦ୍‌ଘାଟନା ମନୋଯୋଗେର ସେଇ ଏକଇ ରକମ ଧିକିଧିକି ଆଗୁନ । ଶୁଣଲେନ, ଶହରେ ବିଶେଷ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିରା ଘୁରେ ବେଡ଼ାଯ । ତାରା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଓପରେ ନଜର ରାଖେ । ଯଦି କଥନଓ ଦେଖେ ଯେ କେଉଁ ଅସଦାଚରଣ କରଛେ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜୀବନ-ସାପନ କରଛେ ତାହଲେ ବର୍ବୁଭାବେ ତାକେ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ । ତାଦେର ଏମନଭାବେ ବାହାଇ କରା ହ୍ୟ ଯେନ ଶହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଲାକାଯ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଥାକେ ଏବଂ ଏହିଭାବେ ଶହରେ ସର୍ବତ୍ର “ଚୋଥ ରାଖା ହ୍ୟ” । ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଓଯାର ଜନ୍ୟ ଆର କିଛୁ କରାର ଦରକାର ନେଇ, ଶୁଦ୍ଧ ରବିବାରେ ଦିନଟିତେ ରାତ୍ରାଯ ରାତ୍ରାଯ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଲେଇ ହଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକେ କଠୋରଭାବେ ମନେ କରିଯେ ଦେଓଯା ହବେ ଯେ ଗିର୍ଜାଯ ଯାବାର ସମୟ ହେୟାଇଛେ ।

ଏହି ଶାସ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଶହରେ, ଯେଥାନେ ସବକିଛୁଇ ଏତ ଧୀର-ସ୍ଥିର ଓ ଶାସ୍ତି-ଶିଷ୍ଟ, ମେଖାନେ ଏଥନେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଛେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସାର୍ଭତ୍ତାମେର ଆଜ୍ଞା । ସ୍ପେନଦେଶୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ସାର୍ଭତ୍ତାମ୍ବଦ୍ୟ ଆଶା କରେଛିଲେନ ସୁଇଜାରଲ୍ୟାନ୍ଡେ ଏସେ ତିନି ଇନକୁଇଜିଶନେର ଦୃଷ୍ଟି ଥେକେ ନିଜେକେ ଗୋପନ କରତେ ପାରବେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଖ୍ୟାତନାମା ବିଜ୍ଞାନୀ । ମାନବଶରୀରକେ ଗଭୀରଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେଛିଲେନ ଏବଂ ରକ୍ତପ୍ରବାହେର ରହ୍ୟ ଉତ୍ୟାଟନ କରାର ଜନ୍ୟ ସଚେଷ୍ଟ ଛିଲେନ ।

ଜେନେଭାର ଧର୍ମଧଜୀ ନାଗରିକରା ତାକେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦିଲ ଯେ ବହିଟି ଲେଖାର ଜନ୍ୟ ତାକେ ପୁଡ଼ିଯେ ମାରା ହବେ । ତାକେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁଡ଼ିଯେ ମାରା ହଲ ତାହି ନଯ, ଦୁଃଖନ୍ତା ଧରେ ଅନ୍ଧିକୁଣ୍ଡେ ବଲସାନୋ ହଲ ।

ବ୍ରନୋର ଉଚିତ ଛିଲ ଆରଓ ସତର୍କ ହ୍ୟାଯା । ଉଚିତ ଛିଲ ମୁଖ ବନ୍ଧ କରେ ଥାକା । କିନ୍ତୁ ସେଟା ତିନି ଚାଇତେନ ନା, ପାରତେନ ନା । ଏକଜନ ପ୍ରଫେସର-ବେଶୀ ଗଣମୂର୍ତ୍ତେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହ୍ୟ ଗେଲ ତୋ ଆର ରଙ୍ଗେ ନେଇ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକଳକେ ଶୁନିଯେ ହଙ୍କାର ଦିଯେ ଉଠିତେନ, ‘ଏହି ଏକ ଭଣ ଲୋକ ! ବିଜ୍ଞାନେର ସଙ୍ଗ-ଏର କୋନୋ ମିଳ ନେଇ’ ।

ଜେନେଭାଯ ବ୍ରନୋର ହାଜିର ହ୍ୟାଯାର କରେକ ମାସ ପରେ ବହିଯେର ଦୋକାନଗୁଲୋତେ ବ୍ରନୋର ଲେଖା ପୁଷ୍ଟିକା ଦେଖା ଗେଲ । ପୁଷ୍ଟିକାଯ ତିନି ଜେନେଭାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଣେର ଅଞ୍ଜତା ଥିବାକୁ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଏହିଟିକୁଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଛିଲ । ବ୍ରନୋର ବିଚାର ହଲ ଏବଂ ତାକେ ଜେନେଭାର କାରାଗାରେ ବନ୍ଦି କରା ହଲ ।

ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆରଓ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରାର ମତୋ ସମୟ ତଥନେ ତିନି ପାନନି । ତାଇ ଅଙ୍ଗଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତାକେ ଛେଡେ ଦେଓଯା ହଲ । କିନ୍ତୁ ତାକେ ପରିଷକାର କରେ ଜାନିଯେ ଦେଓଯା ହଲ ଯେ ଜେନେଭାର ମାନୁଷେର ଆତିଥେୟତା ତିନି ଯେନ ଆର ଆଶା ନା କରେନ । ଅଶାସ୍ତ ଅତିଥି ଜେନେଭା ତ୍ୟାଗ କରଲେନ ।

କିଛୁଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତାକେ ଦେଖା ଗେଲ ତୁଳୁଜ-ଏ, ଛାତ୍ରଦେର କ୍ଲାଶ ନିଚେନ । ସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଟା ବିଜ୍ଞାନେର ସ୍ଥାନ ଯଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟେ ନା ହ୍ୟ ତାହଲେ ଆର କୋଥାଯ ହବେ !

ଖୁବ ଭୋରେ, ଅନ୍ଧକାର ଥାକତେଇ, ହାତେ ମୋମବାତି ଓ ନୋଟବଟ ନିଯେ ଛାତ୍ରର କ୍ଲାଶରେ ଛୁଟେ ଯାଯ । ଏହି ନତୁନ ତରଣ ଶିକ୍ଷକର କଥା ମୁହଁ ହ୍ୟେ ତାରା ଶୋନେ । ନତୁନ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଚୀନ

স্থিতধী অধ্যাপকদের থেকে কতই না আলাদা। প্রাচীন এই অধ্যাপকরা বছরের পর বছর একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। তাঁরা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে স্পষ্ট জিনিসও অস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, “পাম্প জল পাম্প করে কারণ প্রকৃতিজগতে শূন্যস্থান থাকতে পারে না; আফিম খেলে বিমুনি আসে, কেন না আফিমের ধর্মই হচ্ছে বিমুনি আনা...”

শুনতে শুনতে ছাত্রদের মনে হয়, অধ্যাপকদের প্রকৃতির মধ্যেই বিমুনি ধরানোর ধর্ম থেকে গিয়েছে, যদিও সেখানে শূন্যস্থান থাকার আশঙ্কা নেই।

নতুন শিক্ষক এইরকম নন। যখন তিনি পড়ান, ছাত্রদের খাগের কলম তাদের নেটবইয়ের পৃষ্ঠায় বিঁধে যায়। শিক্ষকের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রাখা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর শিক্ষকের চিন্তাপ্রবাহের দুরগামী যে সারা বিশ্ব তা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

তিনি তাদের শেখান যা-কিছু অভাস্ত বলে মনে করা হচ্ছে তাকেই সন্দেহ করতে। তিনি খোদ আরিস্টটলের বিরোধী, প্রেটোরও বিরোধী।

হাজার বছর পরে ডিমোক্রিটাসের অনুগামী ও প্লেটোর অনুগামীদের মধ্যে সংগ্রাম নতুন শক্তি নিয়ে প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে। প্লেটোর পুস্তিকগুলি শতাব্দের পর শতাব্দি নিরাপদে পার হয়ে এসেছে। পুস্তকগুলিকে রক্ষা করেছে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় উভয় শক্তিই। কেন না, পৌত্রলিক প্লেটোও কি খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদদের মতোই এই শিক্ষা দেননি যে এই বিশ্ব সৈরারের সৃষ্টি এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পরপারে পুরস্কৃত হন?

কিন্তু নিরীশ্বরবাদী ডিমোক্রিটাসের পুস্তকগুলির প্রতি সময় সদয় থাকেনি। সবই লোপ পেয়েছে, শুধু অন্য লেখকদের রচনার মধ্যে কিছু টুকরো অংশ আকস্মিকভাবে বেঁচে গিয়েছে। কি পৌত্রলিক, কি খ্রিস্টান — উভয় দলই ডিমোক্রিটাসের পুস্তক পুড়িয়েছে।

আর এখন ভশ্ম থেকে এই পুস্তকগুলিকে আবার যেন উদ্ধার করা হচ্ছে। ডিমোক্রিটাস আবার যেন প্লেটোর সঙ্গে সংগ্রাম চালাচ্ছেন। এবং ডিমোক্রিটাসের অনুগামীদের আবার নিরীশ্বরবাদী বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

তুলুজ ছেড়ে ঝুনো প্যারিসে চলে এলেন।

প্যারিসে ল্যুগেনটরা সদ্য তখন গণ-হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। তাদের বাড়ির দরজা থেকে ক্রুশচিহ্নগুলো তখনও মুছে ফেলা হয়নি। এই যে পুল, যেখানে আবার জমজমাট ব্যবসা শুরু হয়েছে, সেখানেই ক্যাথলিকরা পলায়মান ল্যুগেনটদের হত্যা করেছিল এবং মৃতদেহগুলো সিন নদীর জলে নিক্ষেপ করেছিল। রাজপ্রাসাদের জানলা ও বারান্দা থেকে মহিলারা তাকিয়ে দেখেছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার সুযোগ যাতে ফসকে না যায় সেজন্য মহিলারা অভাবিতপূর্ব সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। সেটি ছিল রক্তমাখা ছুটির দিন, অসহিষ্ণুতার জয়লাভের দিন। ১৫৭২ সালের ২৩ থেকে ২৪ আগস্ট — সেন্ট বার্থেলোমিউর ইভ নামে খ্যাত এই একটি মাত্র রাতে — ক্যাথলিকরা প্যারিসের তিন হাজার ল্যুগেনটকে হত্যা করেছিল।

ঝুনোর মনে রাখা উচিত ছিল যে এখানে, এই প্যারিসেই, ভাড়াটে খুনিরা সাহসী চিন্তাকারী পিয়ের দ্য ল্য রামে-কে রাস্তায় খুন করেছিল। প্রথমে তাঁর লেখা পুস্তকগুলি পোড়ানো হয়েছিল। তারপর সেই পুস্তকগুলির লেখককেও মেরে ফেলা হয়।

গোড়ার দিকে ব্রহ্মনের ওপরে ভাগ্য সুপ্রসম ছিল। তাঁকে রাজার সামনে উপস্থিত করা হয়। যা কিছু নতুন তার ওপরে এই তরঙ্গ রাজার দুর্বলতা ছিল। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা তাঁর কাছে ছিল অসাধারণ এক বিষয়ান্তর — তিনি মুঝ হলেন। ব্রহ্মনোকে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন এবং উপাসনা-সভায় যোগ দেওয়া থেকে অব্যাহতি দিলেন।

ব্রহ্মনো ইচ্ছে করলে রাজসভার পশ্চিম হতে পারতেন। তাতে তাঁর পদব্যর্যাদা ও ভূষণ বাড়ত। কিন্তু ব্রহ্মনোর মতো মানুষের গায়ে আজ্ঞাবহের পোশাক চড়ানো চলে না। তিনি খৎ-বন্দি নন। তিনি যোদ্ধা। তিনি বেরিয়েছেন জগতকে বিজ্ঞানের পক্ষে জয় করতে। সর্বত্র তিনি বিজ্ঞানের প্রশংসা করছেন। ব্রহ্মনোর এই মানসীকে কেউ যদি যথোচিত সম্মান না দেখায় তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। সেই গণমূর্খের ওপরে ব্রহ্মনো ডাইনে-বাঁয়ে ঘূষি চালাবেন।

কিন্তু তিনি তো একা, অন্যরা বহু। অন্যরা কখন তাঁকে কারাগারে নিষ্কেপ করবে সেই অপেক্ষায় না থেকে তিনি একটা জাহাজে চড়ে বসলেন এবং ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন।...

ব্রহ্মনো এখন অক্সফোর্ডে এসেছেন। আলোচনা-সভার মধ্যেও উপস্থিত হয়েছেন এবং দ্বন্দ্যবুক্ষে যোগ দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্যবুক্ষে মানুষরা লড়াই করছে তলোয়ার দিয়ে নয়, যুদ্ধ দ্বন্দ্যবুক্ষে যোগ দিয়েছেন। আঘাতকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রহের নির্দেশ ও বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে। দিয়ে। আঘাতকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রহের নির্দেশ ও বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে। দিয়ে। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায়, রাজ-দরবার ও বিদেশের রাষ্ট্রদূতদের দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং রাণী। তেরটি বিষয় ব্রহ্মনো খণ্ডন করেছেন, অর্থাৎ শিরোমণিরা — এবং রয়েছেন স্বয়ং রাণী। তেরটি বিষয় ব্রহ্মনো খণ্ডন করেছেন, অর্থাৎ তেরটি মারাত্মক আঘাত হেনেছেন তাঁর বিরোধীর ওপরে যিনি অক্সফোর্ডের অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পশ্চিম।

অধ্যাপকটি নিরস্ত হয়ে গেলেন। পরাজিত হবার পরে তিনি তাঁর বিরোধীকে অশ্রীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন তাঁর মান্যবর সতীর্থরা। তাঁদের অঙ্গের ভূষণ কুটিলতায় বাঁকা হয়ে গেল। তাঁদের ঠোঁট থেকে অশ্রীল গালাগালি 'বর্বিত হতে লাগল।

বিতর্ক শেষ হয়ে গেল। মান্যবর অতিথিরা বিভিন্ন পথে নিষ্কাস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু বিজয়ীকে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হল। তাঁর পেছন থেকে চিংকার শোনা যেতে লাগল : ‘দূর হও! তুমি যেন আরিস্টটলের চেয়েও পশ্চিম! তুমি যেন প্রেটোর চেয়েও বেশি জানো! কোথাকার মাতব্বর তুমি, দূর হও! কোথেকে হাজির হলে, অভদ্র ছোকরা, তোমার এত সাহস যে শ্রোতের বিরুদ্ধে যেতে চাও!’

বিশ্ব যতই বড় হয়ে উঠুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে এই বিশ্ব এখন খুবই ছোট! কোথায় যেতে পারেন তিনি?

লন্ডন, প্যারিস, মাগডেবুর্গ, ভিট্টেনবার্গ।...

দূর থেকে দূরে, দেশ থেকে দেশে, এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে। আরও কত আছে! সারা বিশ্ব ভাগ হয়ে গিয়েছে বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাজ্য, নগরে ও সম্প্রদায়ে।

ব্রহ্মনো সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, অতএব সকল সম্প্রদায়ের কাছে তিনি অবিশ্বাসী। তাঁর সম্মুখে রয়েছে অসীম মহাবিশ্ব, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে তাঁর জন্যে কোনো স্থান নেই। তিনি প্রচার করছেন মানুষের মহত্ত্ব, কিন্তু তাঁর চারিদিকে যে-সব মানুষ রয়েছে তারা বন্যজন্মের চেয়েও হিংস্রভাবে একে অপরের ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছে।

কিন্তু তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে অন্য কিছু তিনি হতে পারেন না, হবার ইচ্ছাও তাঁর নেই। একজন মানুষ যখন স্পষ্টভাবে দেখতে শুরু করে তখন আবার অন্ধ মানুষের মতো বেঁচে থাকাটা তার মনঃপূত হতে পারে না।

দূর থেকে দূরে। প্রাগ, হেল্মস্টাট, ফ্রাঙ্কফুর্ট।...

নগর থেকে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঝুনো। বিজ্ঞানের জয়গান গাইলেন — এমন সব জায়গায় যেখানকার ময়দানে সাহসী চিন্তাকারীদের পুস্তক শিঙা বাজিয়ে পোড়ানো হয়েছে।

“অন্ধকারের মানুষদের” বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেলেন। প্রাহারের বিরুদ্ধে প্রহার ফিরিয়ে দিলেন। আঘাত করলেন নীচতাকে, দমন করলেন উন্নত্যকে, উদ্যাটিত করলেন অজ্ঞতাকে। যেখানেই দৃষ্টিপাত করছেন দেখতে পাচ্ছেন অসহিষ্ণুতা; গুপ্তচর, ধর্মান্ধ, ভণ্ড ও নির্বোধরা ইতিহাসের রথের চাকা আঁকড়ে ধরে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

স্বাধীন চিন্তার স্থান কোথাও নেই। তাই যদি হয় তাহলে স্বদেশ ছেড়ে আসার সার্থকতা কী? মানুষকে ভালোবাসেন ঝুনো, আর এখন পর্যন্ত তাঁর নিজের দেশই সারা বিশ্বে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দেশ। তার কারণ, যে মানুষের হৃদয় বিরাট, যে মানুষ সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, সে তো নিজের দেশকে ভালবাসবেই — সক্ষীর্ণ, অকিঞ্চিত্কর, আগ্নেয়গ্রামী ও শুন্দি অস্তঃকরণের মানুষের চেয়েও গভীরভাবে।

ঝুনো ইতালিতে ফিরে গেলেন। যদি তাঁকে মরতেই হয় তাহলে বরং নিজের দেশের মাটির ওপরে, নিজের দেশের আকাশের নীচে মরাই ভালো। তাঁর প্রিয় কবি লুক্রেটিয়াস সে দেশের প্রকৃতির গুণগান করেছেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সে দেশে কাজ করেছেন।

যত বছর ধরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সময়ে ইতালির কথা ভোলেন নি। অন্যদিকে ইতালিও তাঁর কথা ভোলেনি। ডেমিনিকানরা কেবলই ভাবছিল বয়ে যাওয়া ভ্রাতাটিকে আবার কী করে নিজেদের গণির মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায়। এই উদ্দেশ্যে নিপুণভাবে জাল পাতা হল। তার সঙ্গে জড়িত থাকল ডেমিনিকানরা, সেখান থেকে পাপ স্থীকারের কথা শ্রবণকারী ধর্মগুরু, সেখান থেকে ভেনিসের এক অভিজাত তরুণ। এই অভিজাত তরুণ বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানাল ঝুনোকে — ঝুনো যদি তার গৃহে আসেন তাহলে শাস্তিতে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা তিনি ঝুনোর জন্যে করে দেবেন।

খুবই লোভনীয় আমন্ত্রণ। ঝুনো ভেনিসে চলে এলেন এবং ফাঁদে ধরা পড়লেন।

ভবিষ্যতের দিকে মানুষের দৃষ্টি

খুব বেশি দিন ঝুনো স্বদেশের আকাশ উপভোগ করতে পারলেন না। ভেনিসের কারাগারে ছোট্ট জানলা দিয়ে সেই আকাশ বড়ো একটা দেখাও যায় না।

জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। একটা বেঞ্চির ওপরে তিনি বসেন। তাঁর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা থাকে। তাঁর সামনে একটা মঞ্চের ওপরে বসেন বিচারকরা ও ফাদার বিচারপতি। ফাদার বা পিতা এবং ব্রাদার বা ভ্রাতা হিসেবে কী চমৎকার পরিচয়ই না তাঁরা দিচ্ছেন! “পিতৃসূলভ” ও “ভ্রাতৃসূলভ” ভালবাসার নামে কত অপরাধই না তাঁরা করছেন!

সব কিছু স্বাভাবিকভাবে ঘটে যাচ্ছে — গোড়ার দিকে শুধুই জিজ্ঞাসাবাদ, পরে জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক নির্যাতন। বিচারকদের হাতে এমন সব পদ্ধতি আছে যা প্রয়োগ করলে যে-কাজ মানুষ করেনি তাও করেছে বলে স্বীকার করে নেয়! নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা জানেন কী ভাবে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মানুষের ইচ্ছাক্ষেত্র গুঁড়িয়ে দিতে হয়। এটি একটি বিশেষ কলাকৌশল। প্রথমে হাতদুটোকে দড়ি দিয়ে পেঁচানো হয়। দড়ির গিঁটে একটি লাঠি থাকে, যা সহজেই ঘোরানো যায়। বন্দিকে স্বীকারোক্তি করতে বলা হয়। যদি স্বীকারোক্তি না করে তাহলে লাঠিটা ঘোরানো হয় আর শরীরের মাংসে লাঠিটা গভীর হয়ে কেটে বসে।

বন্দি যদি তবুও চুপ করে থাকে তখন লাঠিটা আরো একবার ঘোরানো হয়, আরো একবার, আরো একবার। পাঁচ, দশ, কুড়ি বার! বন্দিকে আরো একবার বলা হয় যে সে ঈশ্বরের নামে স্বীকারোক্তি করুক। কথাটা যদি সে না শোনে তাহলে জল ও আগুন ব্যবহার করা হয়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এক বালতি জল ও একপাত্র জলস্ত কয়লা। বালতির জল ঢেলে দেওয়া হয় বন্দির গলায়। ‘যদি সে মারা যায়, সেটা তারই দোষ।’ লাল করে তাতানো লোহা দিয়ে তাঁর মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়: ‘সে স্বীকার করছে না, অতএব তার প্রতি কোনো করণা নয়।’

নির্যাতন চলতেই থাকে। ফাদার বিচারপতিরা কারাগারের মধ্যেই দিন ও রাত্রি কাটান। সেখানেই পানভোজন করেন। নির্যাতন চালানোর প্রকোষ্ঠেই তাঁদের ঘর, নির্যাতন চালানোই তাঁদের বিনোদন।

এমনিভাবে ক্রন্তো নির্যাতিত হতে থাকেন।

আট সপ্তাহ পার হয়।

কী অত্যাচারই না চলেছে তাঁর শরীরের ওপরে। কারাগারের উত্তপ্ত সীসার ছাদ কী কষ্টকর আর কী শ্বাসরোধী! জীবনটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত!

কিন্তু বিচারপতিরা তো শুধু তাঁর প্রাণহনন চান না, তার আগে চান তাঁর প্রাণশক্তি হনন।

ক্রন্তোকে তাঁরা রোমে নিয়ে গেলেন। রোমের বিচারপতিরা এমন এক চমৎকার শিকারকে হাতে পেয়ে সেটিকে আর ভেনিসের বিচারপতিদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। ছুঁটি বছর তাঁরা কাটালেন এই অত্যাচারিত নির্যাতিত শরীর নিয়ে। বিচারপতিরা জানতেন ক্রন্তোর মনের জোর খুবই বেশি, তাঁর জ্ঞান বিশাল। যুক্তি তর্কে তাঁকে হারাতে পারে এমন দাশনিকের জন্ম এখনও পর্যন্ত হয়নি। অতএব ক্রন্তোকে নিজের খণ্ডন নিজেকেই করতে হবে। মরবার আগে তাঁর নিজের শিক্ষাকে নিজেই হত্যা করে যেতে হবে। তিনি বিজ্ঞানকে প্রশংসা করেছেন, বিজ্ঞান-মানসীকে রক্ষা করেছেন। এবার তাহলে তাঁকে সকলের সামনে তাঁর মানসীর মুখে থুতু দিতে হবে, মানসীকে গালাগালি দিতে হবে, মানসীকে চিরকালের জন্যে ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু যত নির্যাতনই চলুক ক্রন্তোকে দিয়ে এ-কাজ করানো যাবে না, এই পরীক্ষার জন্যে বহুকাল ধরেই তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। অনেকবারই নিজেকে বলেছেন, ‘চালিয়ে যাও। সাহস হারিও না। এমনকি যদি অজ্ঞানের আদালত তোমাকে হমকি দেয় এবং তোমার মহৎ শ্রম ধর্ম করতে চেষ্টা করে তাহলে পিছু হটো না।

“ଆছେ ବିଚାରବୁଦ୍ଧିର ଆରଓ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରସଭା ଯେଥାନେ ଅନ୍ଧକାର ଥେକେ ଆଲୋକକେ ଆଲାଦା କରେ ଚେନା ଯାଯାଇଁ। ମେଥାନେ ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପକ୍ଷେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାବେ ଖାଟି ଓ ସଂ ସାକ୍ଷୀ ଓ ରକ୍ଷାକାରୀରା। ତୋମାର ଶକ୍ତରା ନିଜେଦେର ବିବେକେର ମଧ୍ୟେଇ ତୋମାର ପ୍ରତିଶୋଧଗ୍ରହଣକାରୀଦେର ଦେଖତେ ପାବେ ।”

অলিন্দে আরও একবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুলে গেল দরজা। ক্রনোর সামনে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ — ডেমিনিকান সম্প্রদায়ের প্রধান। বন্দিকে আরও একবার স্থীকার করতে বলা হল যে তাঁর শিক্ষা ধর্মবিরোধী এবং এই ভাস্তু শিক্ষা তিনি অস্বীকার করছেন। আর বারে বারেই বিপুল সাহসিকতার সঙ্গে ক্রনো জবাব দিলেন, “না, তা হতে পারে না, কোনো কিছু প্রত্যাহার করার ইচ্ছে আমার নেই। কোনো কিছু অস্বীকার করারও নেই।”

বিচারসভার শেষ অধিবেশন বসল। ক্রমে ছিলেন প্রধান বিচারপতির প্রাসাদে। তাঁকে নতজান করে বসানো হল, তারপর বিচারসভার সিদ্ধান্ত পাঠ করা হল।

কথাগুলো খুবই সরল, কিন্তু তার অর্থ যে কী ভয়ঙ্কর সেটা ত্রুণো ভালভাবেই বুঝতে পারলেন। কথাগুলো এই রকম: ‘‘আতা জিওর্দানোকে প্রশাসনিক শক্তির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা যেন যতদূর সাধ্য কোমলতম উপায়ে, বিনা রক্ষপাতে, তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।’’

এই কোমলতার দাম কী তিনি জানেন। এই লোকগুলো নির্যাতন চালায় কোমলভাবে, বিকলাঙ্গ করে বিনা আক্রমণে, পড়িয়ে মারে করুণার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মাথা তুললেন। তাঁর চোখে ঘৃণা। বললেন, ‘‘আপনারা রায় ঘোষণা কৰছেন, শুনে আমার যতটা ভয় হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়েছেন আপনারা।’’

হঁ, কথাটা ঠিক, রায়দানকারীদের চেয়ে তিনি কম ভীত। তিনি তো মরবেন, কিন্তু যার জন্যে তিনি প্রাণ দিচ্ছেন তা বেঁচে থাকবে। আর যদিও তাঁর নির্যাতনকারীরা আরও কয়েকটা বছর বেশি বেঁচে থাকবে, কিন্তু তারা যে বীভৎস ও জঘন্য কাজটি করল তা ইতিহাসের পাতায় নিন্দিত হবে।

ক্রনোকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। কিন্তু অন্য নেতারা ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের মাঠে নেমে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই গ্যালিলিও প্রস্তুত করেছেন বিজ্ঞানের সপক্ষে নতুন সব অকাট্য যুক্তি এবং জোরগলায় ঘোষণা করেছেন, “আরিস্টটলের চেয়ে ডিমোক্রিটাসের যুক্তি শ্রেয়তর।” ইতিমধ্যেই দক্ষ কারিগরদের হাতে লেস পালিশ হচ্ছে। অন্যদিনের মধ্যেই এই সমস্ত লেস জোড়া লাগিয়ে তৈরি হবে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র। অনুমান করার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। অবিস্বাদিত প্রমাণ উপস্থিত করার সময় এসে গিয়েছে। লোকে এক সময়ে কেবল তাদের বুদ্ধির চোখ দিয়ে যা দেখতে পেত তা শীঘ্ৰই দেখতে পাবে তাদের শারীরিক চোখ দিয়ে।...

ଦିନଟି ୧୬୦୦ ସାଲେର ୧୭ଇ ଫେବ୍ରୁଆରି।

ଦିନାତ୍ ଉତ୍ସବ ଶାରୀର ପରିମାଣରେ — ବିଖ୍ୟାତ
ରୋମେର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନୁଷ ଛୁଟେ ଚଲେଛେ ଅସାଧାରଣ ଏକ ଦୃଷ୍ୟ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ — ବିଖ୍ୟାତ
ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସୀକେ ଆଜ ନାକି ପୁଡ଼ିଯେ ମାରା ହବେ । ସ୍ଵର୍ଗ ପୋପ ପଞ୍ଚାଶଜନ କାର୍ଡିନାଲ ସହ
ସେଥାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାକବେନ । ଉପସ୍ଥିତ ଥାକବେନ ଗିର୍ଜାର ଏଇ ମହାନ ଉତ୍ସବେର ଜନ୍ୟ ସକଳ

দেশ থেকে সমাগত তীর্থ্যাত্রীরা। সম্পূর্ণ ময়দানটি এবং আশেপাশের সকল রাস্তা জনাকীর্ণ। এমনকি বাড়ির ছাদেও মানুষের ভিড়।

প্রাচীনকালে খিস্টানদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা দেখার জন্যে রোমানরা বিরাট মেলাপ্রাঙ্গণে ভিড় করত। এখন তাদের বংশধররা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাকি করছে নতুন সত্যের উদ্গাতাকে পুড়িয়ে মারার দৃশ্য দেখার জন্যে। সত্যদ্রষ্টার সম্মানের হানি হয় না — একমাত্র নিজের দেশ বাদে। রোমানরা এমন একজন মানুষের ওপরে গালিগালাজ বর্ষণ করছে যাঁকে নিয়ে তাঁদের গর্বিত হওয়া উচিত ছিল।

ওই সেই মানুষটি, নিজের ভবিতব্যের দিকে হেঁটে চলেছেন।

ক্রনোকে ঢিলে পোশাক পরানো হয়েছে। পোশাকের ওপরে লেজ ও নরকের আগুনের জিভওলা শয়তানের ছবি আঁকা। উন্টুট একটা টুপি তাঁর মাথার ওপরে বসানো। এসব করা হয়েছে অবিশ্বাসীর চেহারা হাস্যকর ও করুণ করে তোলার জন্য। কিন্তু লোকের মুখের হাসি উবে গেল যখন তারা তাকিয়ে দেখল সেই ফ্যাকাশে মুখ আর তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকা সেই চোখ-জোড়া।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, “ওর তো আনন্দ হওয়া উচিত। এক্ষুনি ওকে ঠেলে তুলে দেওয়া হবে সেই জগতে যা ওরই আবিষ্কার।” কিন্তু এই ঠাট্টার কথা শুনেও বিশেষ কেউ হাসল না।

শাস্তিভাবে ক্রনো মই বেয়ে কাঠের উঁচু স্তুপের ওপরে উঠলেন। জল্লাদ এসে তাঁকে খুঁটির সঙ্গে শেকল দিয়ে আলগাভাবে বেঁধে দিল। জল্লাদের মাথায় একটি ঢাকা, শুধু দেখার জন্যে তাতে দুই চোখের সামনে দুটো ফুটো। শহীদ মানুষটি অকুতোভয়ে সকলের চোখের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু জল্লাদকে মুখোশটি দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়েছে।

কাঠে আগুন লাগানো হল। বাতাসে আগুন বাঢ়তে লাগল। আগুনের শিখা ক্রনোর পা বেয়ে উঠে পোশাকের ওপর দিয়ে ছুটে চলল।

মঠের যেসব সাধু কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তারা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। হয়তো এই একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্রনো ভেঙে পড়বে। কিন্তু তাদের আশা বৃথা হল। করুণা ভিক্ষা করে কোনো আকৃতি শোনা গেল না, মুখ থেকে কোনো আর্ত চিৎকার পর্যন্ত নয়।

আর্ত চিৎকার তিনি দমন করেছিলেন কী উপায়ে? এই শেষ মুহূর্তে তিনি কী ভাবছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু অনিবার্য এই শেষদিনের কথা ভেবে এক সময়ে তিনি যা লিখেছিলেন তা আমরা জানি : ‘জয়লাভ করা সম্ভব এই বিশ্বাস নিয়ে আমি সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছি। কিন্তু আমার আত্মায় যে শক্তি নিহিত আছে তা থেকে আমার শরীর বঞ্চিত।... কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে ভবিষ্যৎ কাল আমাকে কৃতিত্ব দেবে।’

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষরা বলবে, “মৃত্যুর ভয় তিনি জানতেন না। তাঁর চরিত্রের জোর ছিল অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশি। তিনি মনে করতেন, সত্যের জন্য সংগ্রাম জীবনের সেরা আনন্দ।” ■

তেজ

পার্সি বিসি শেলি

“শৈশবেতে মায়ের সাথে দেখতে গেলাম ঠিক,
জীবন্ত এক জুলছে মানুষ, সে নাকি নাস্তিক।
চিতা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যাজক-শ্রেণির দল;
হাজার মানুষ এসব দেখেও নীরব নিশ্চল।
‘অপরাধী’ পুড়ছে; মুখে নিভীকতার ছাপ,
বুক-ভরা তাঁর তাচ্ছিল্য নেই চোখে উত্তাপ।
ওঠে হাসি; মুখাবয়ব শাস্ত দীপ্তি ভরা,
অনল শিখা জড়িয়ে ধরে মৃত্যু ডাকে ঘুরা।
আগি কাড়ে দৃষ্টি তবু, প্রশাস্ত তাঁর মুখ,
তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণা মোর দীর্ঘ করে বুক।
অনুভূতিহীন জনতা ভীড় করেছে যত,
চলছে জয়োল্লাস, আমি কাঁদছি অবিরত।
মা বলে থামরে বাছা, এবার তোকে জানাই
এই মানুষ-ই বলেছেন, ঈশ্বর কিছু নাই।”

অনুবাদ: শঙ্কর কুমার নাথ



জিওর্দানো ব্রনো
সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদিতার
অনিবাগ দীপশিখা

অশোক মুখোপাধ্যায়

স্থান — পোল্যান্ডের থর্ন শহরের প্রাণ্টে এক সমাধিস্থল।

কাল — ১৫৬৬ সাল।

পাত্র — আঠারো বছরের একজন ইতালীয় তরুণ।

পাদ্রির সাদা জোবা পরিহিত এই তরুণটি এসেছে একজন বহুপ্রশংসিত বহু নিন্দিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সমাধিতে দু মুঠো ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সমাধিস্থলটি দেখে তার দুচোখ কপালে উঠে গেল। স্থলের গায়ে উৎকীর্ণ প্রার্থনা বাক্যটি এই রকম : “হে ভগবান, তুমি পলকে যে করুণা দান করেছ তা আমি আমার জন্য চাই না; পিটারকে যা দিয়েছ তাও আমার কাম্য নয়। আমাকে তুমি শুধু সেইটুই করুণা দিও যা তুমি ক্রুশবিন্দু চোরকে দিয়ে থাকো।”

এই মরণোত্তর চোরতুল্য সম্মান যাঁকে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব দিয়েছিল তাঁর নাম নিকোলাস কোপার্নিকাস। আর এই সমাধিস্থল দেখতে এসে এই সাম্মানিক বাণীটি পড়ে যে স্তুতি হয়ে গিয়েছিল তাঁর নাম ফিলিপো জিওর্দনো বৃন্দো।

[১]

কোপার্নিকাসের মৃত্যুর (১৫৪৩) পাঁচ বছর পরে ১৫৪৮ সালে তাঁর জন্ম হয়। পনের বছর বয়সে তিনি তথনকার ঐতিহ্য অনুযায়ী ডোমিনিকান মঠে দীক্ষা নিয়ে যাজক জীবন শুরু করেন। পড়াশুনায় তিনি বরাবরই খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। তাই মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইপত্রে তাঁর ছিল অবাধ ধরাছেঁয়ার অধিকার। সেই সুবাদেই তিনি প্রয়াত অধ্যাপক কোপার্নিকাসের *De Revolutionibus Orbium Coelestium* (স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন) শীর্ষক লাতিন ভাষায় লেখা বইটিও পড়ে ফেলেছিলেন। পড়ে অত্যন্ত উন্মুক্ত হয়েই তিনি এই মহান বিজ্ঞানীর সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ্য দিতে এসেছিলেন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কোপার্নিকাসের বইটা তখনও রোমান ক্যাথলিক গির্জার কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করেনি। বইটা সম্পর্কে তাদের একটু অস্বস্তি ছিলই। তারা বুঝেছিল — বইটিতে এমন কিছু বিষয় উৎপাদিত হয়ে ই যা ধর্মতত্ত্বের সন্তান ও প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে খাপ খায় না। চার্চের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে ঠিক মেলে না। তবে বাঁচায় এই যে বইটা মহান পোপের উদ্দেশেই উৎসর্গ করা হয়েছে এবং বৃক্ষিমান থকাশক — লেখকের বন্ধু আন্দ্রিয়াস ওসিয়েন্দার — ভূমিকায় লিখেছেন যে এই বইতে পৃথিবীর যে আবর্তনগতির কথা বলা হয়েছে সেটা নেহাতই একটা কাঙ্গনিক প্রস্তাব

(hypothesis)। এর সাথে বাস্তব তথ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তো কত রকম গাণিতিক কল্পনাই করতে হয়। কোপার্নিকাসও সেরকমই করেছেন।

জিওর্দানোর এটা বিশ্বাসও হয়নি, মনঃপূতও হয়নি। তিনি ভাবতে লাগলেন — এটা কীরকম ব্যাপার? একটা শ্রেফ কাল্পনিক চিন্তার জন্য এতবড় একটা বই লেখার এবং প্রকাশ করার দরকার হল কেন? হয়ত এটাও তিনি জেনে থাকতে পারেন যে, ১৫৩০ সালে কোপার্নিকাস একটা ছোট পুস্তিকা — মন্তব্যরাজি (Commentariolus) — লিখে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের পড়তে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে লেখা ছিল। বইটা তিনি যতবারই পড়েন ততই দৃঢ়নিশ্চয় হতে থাকেন — ভূমিকায় প্রকাশক সত্য কথা বলেননি। তিনি তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতে শুরু করলেন — এত বড় একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার শুধুমাত্র এই ভূমিকাটির জন্য সমাজে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। যিনি এটা লিখেছেন এবং যাঁদের জন্য এটা লিখেছেন — তাঁরা সকলেই এক একটি আন্ত গর্দভঃ (পাঞ্চটীকা-১ দ্রষ্টব্য)।

ক্রনোর বাসস্থান দক্ষিণ ইতালির নোলা শহরে। ইতিহাসে সুপরিচিত ভেনিস বা নেপল্স শহর থেকে তা এমন কিছু দূরে নয়। ফলে সে সব জায়গায় ধর্মরক্ষাকর্তাদের কানে তাঁর এইসব বিষ্ফোরক কথাবার্তা পৌছতে দেরি হল না। তারাও সকলেই হই-হই রহি-রহি করে উঠল। কোথায় সেই অবিশ্বাসী পাষণ্ড খ্রিস্টবিদ্বেষী? ঈশ্বরের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করছে মানে তো ও ঈশ্বরকেই চ্যালেঞ্জ করছে! ওর গা থেকে যাজকের সাদা পোশাক খুলে নাও। ওকে ধরে বেঁধে আনো। ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা দরকার। ক্রনোর কাছেও এই তর্জন গর্জনের খবর অচিরেই এসে গেল। তিনি বুঝলেন, তাঁর পক্ষে অবাধে ঘুরে বেড়ানো এবং খোলাখুলি সর্বসমক্ষে মতপ্রকাশ করা আর নিরাপদ নয়। জন্মস্থান, প্রিয় নোলা শহর ছেড়ে তাঁকে জন্মের মতো বেরিয়ে পড়তে হল। বয়স তখন তাঁর আঠাশ। সময়টা ১৫৭৬।



ক্লিডিয়াস তলেমি (৯০ - ১৬৮)

ইতালির মধ্যেই ক্রনো গির্জার লালচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরতে লাগলেন আর তাঁর নিজের মনের খটকাগুলি বলতে লাগলেন। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বা ঐশ্঵রিক বিধানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা হবে কেন? তিনি নিজেও ঈশ্বরবিশ্বাসী, বিশ্বচরাচরের সর্বত্রই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আস্থাবান। দাশনিক চিন্তায় তিনি সর্বেশ্বরবাদী (pantheist)। কিন্তু ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বও তো মানুষের আবিষ্কার। সেই প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে দ্বিতীয় শতাব্দীর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ — ফ্লিডিয়াস তলেমি এই তত্ত্বের গাণিতিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। তাতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে পৃথিবীকে রেখে তার চারপাশে সূর্য চন্দ্র বুধ

শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিকে আবর্তনশীল গ্রহ হিসাবে দেখিয়েছিলেন। তারপর নব-প্লাটোনিদী (neoplatonist) দাশনিকরা তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দে এথেন্সের প্রথম বিশপ ডায়োনিসিয়াসের নামে এই তত্ত্বটিকে প্রথম খ্রিস্টীয় মর্যাদায় ভূষিত করেন। তারও অনেক পরে, দ্বাদশ শতাব্দে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খ্রিস্টান অধ্যাপক পিতর লোম্বার্ড (Peter Lombard) দাবি করে বসলেন : “মানুষকে যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ ঈশ্বর ভজনা করতে পারে, তেমনি ঈশ্বর এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করে দিয়েছেন মানুষের কাজে লাগাবার জন্য; তাই তিনি মানুষকে ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মাঝখানে স্থাপন করেছেন যাতে সে একই সঙ্গে সেবা করতেও পারে, পেতেও পারে।”^{১০} তারপর অ্রয়োদশ শতাব্দে এলেন মধ্যযুগীয় লাতিন ইউরোপের সর্বপ্রসিদ্ধ দাশনিক তমাস অ্যাকুইনাস। খ্রিস্টীয় জগতে তিনি সন্ত হিসাবে বিবেচিত ও পূজিত হন। বিরাট এবং ব্যাপক তাঁর

পাঞ্চটীকা-১

কোপার্নিকাসের বই : জালিয়াতি ও কেলেঙ্কারি

ক্রনো ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। কোপার্নিকাস তাঁর বইটি লেখা শেষ করে ১৫৪০ সালে তাঁর বন্ধু ও গণিতের অধ্যাপক রেতিকাসকে দিয়েছিলেন ছাপানোর ব্যবস্থা করতে। রেতিকাস দায়িত্বটা ছেড়ে দেন তাঁদের উভয়ের বন্ধু প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী যাজক ওসিয়েন্দারের হাতে। ওসিয়েন্দার কোপার্নিকাসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বইটাকে শুধুমাত্র একটা গাণিতিক প্রকল্প হিসাবে বের করতে। কিন্তু কোপার্নিকাস তাতে রাজি হননি। যদিও তিনি তখন অসুস্থ থাকায় মুদ্রণের ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই নিতে পারেন নি। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি শুধু একটা ছাপানো বই ছুঁয়ে যেতে পেরেছিলেন।

ধর্মপ্রাণ ওসিয়েন্দার যা করেছিলেন তা অত্যন্ত ন্যক্তারজনক। বইতে শুধু এইরকম একটা গার্ডভ ভূমিকা জুড়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। বইটার মূল নামে ছিল শুধু “আবর্তন”; ওসিয়েন্দার তার সাথে জুড়ে দিলেন “স্বর্গীয় গোলকদের” শব্দ দুটো। যাতে নামটা তলেমির তত্ত্বের সাথে খাপ খেয়ে যায়। অথচ কোপার্নিকাস পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলির সূর্যের চারদিকে আবর্তন নিয়েই বইটা লিখেছিলেন। বইয়ের ভেতরেও সাধ্যমতো কাটাছেড়া করে তিনি ভূমিকার সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তুকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুললেন। বইতে কোপার্নিকাস উল্লেখ করেছিলেন অ্যারিস্টার্কাস, প্লুটার্ক, পিথাগোরীয় সম্প্রদায়, নিকোলাস দ্য কুসা, প্রমুখদের নাম। যাঁরা সকলেই পৃথিবীর আবর্তনের কথা বলেছিলেন। ওসিয়েন্দারের প্রচেষ্টায় সে সব নাম বাদ পড়ে গেল। সমকালীন ছিদ্রাবেষী পণ্ডিতেরা স্বভাবতই কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তোলার সুযোগ পেয়ে গেলেন যে তিনি পূর্বসূরিদের ঝণ স্বীকার না করেই তাঁদের মতবাদকে নিজের মতবাদ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এদিকে কোপার্নিকাসের মূল পাণ্ডিতিপি গেল হারিয়ে। ওসিয়েন্দার যে কোথায় তা লুকিয়ে ফেললেন কাউকে বললেন না। প্রায় আড়াইশ বছর পরে যখন তার হাদিশ পাওয়া গেল তখন বোঝা গেল, ওসিয়েন্দার বন্ধু কোপার্নিকাসের প্রতি কী ভয়ানক রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

(সূত্র: সমরেন্দ্রনাথ সেন — বিজ্ঞানের ইতিহাস (অর্থগু); শৈব্যা, কলিকাতা ১৯৯৪; ২য় খণ্ড পৃঃ ৩০৪-৬; James Jeans — The Growth of Physical Science; Cambridge University Press, Cambridge 1947; pp. 129-32)

বিদ্যাচর্চা। গির্জার সুবিধার্থে তিনি “ধর্মতত্ত্বের বিশ্বকোষ” (Summa Theologica) নামক একটি মহাগ্রন্থ লিখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নির্দেশ করে গেলেন। তিনিও বলে গেলেন — পৃথিবীই জগতের কেন্দ্র! এর পর কার এত দুঃসাহস হবে একে অস্বীকার করার?

কিন্তু ব্রহ্মনো ভাবলেন, মানুষের কি ঈশ্বরের বিধানকে বুঝতে ভুল হতে পারে না? ভুল হলে মানুষ কি তা সংশোধন করে নিতে পারবে না? ঈশ্বর কি মানুষকে শুধু ভুল করার অধিকারই দিয়েছেন? তিনি কি চান না — মানুষ তার ভুলগুলি সংশোধন করতে শিখুক? ইতালির বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং সেখানে শ্রোতাদের এইসব ও আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আবেদন করলেন।

ধর্ম্যাজকরা দেখল — এ তো মহা আপদ! এই জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে যারা মাথা ঘামাবে তারা তো শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর আছে কিনা, ঈশ্বর থাকতে পারে কিনা — সেই প্রশ্নও তুলে বসবে! ব্রহ্মনোর বিরুদ্ধে পোপের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। তাঁকে ধর্মীয় কাঠামো থেকে বহিক্ষার করা হল। ব্রহ্মনো দেখলেন, ইতালি তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তিনি ১৫৭৮ সালে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হলেন।

কিন্তু হায়! ব্রহ্মনোর মাপের মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ইউরোপে তখন খুব একটা বড় জায়গা ছিল না।

[২]

ব্রহ্মনোর সময়কালটা এমন যে মানুষ তখন ধীরে ধীরে অনেক নতুন জিনিস জানতে শুরু করেছে। নবজাগরণের চেউ তখন ইতালি হয়ে ইংলণ্ড, হল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্সের বুকে আছড়ে পড়ছে। প্রাচীনকালে যেমন আমাদের দেশের লোক সসাগরা পৃথিবী বলতে জম্বুদ্বীপ (আসলে উত্তর-পশ্চিম ভারত)-কে বুঝাত, তেমনি, ইউরোপের লোকেরাও ইউরোপকেই পৃথিবীর সীমা বলে মনে করত। এমনকি খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তিস্থান মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কেও তাদের কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। কলম্বাস-ম্যাগেলানের অভিযান এইরকম সংকীর্ণ ধারণায় ঢিঁ ধরাতে শুরু করেছে। সওদাগর বণিকরা তখন বাণিজ্য করতে, নতুন মাল কিনতে, খাদ্যশস্য মশলা বা কাপড় বেচাকেনা করতে, সোনা রূপা হীরার খনি আবিষ্কার দখল ও লুট করতে, নতুন দেশ অধিকার করে উপনিবেশ বানাতে এবং দাস ব্যবসায় হাত পাকাতে দূর দূরান্তে পাড়ি দিচ্ছে। তারা দেখছে — এই দুনিয়ায় নানা ধরনের মানুষ আছে — কত রকম তাদের চেহারা, কত রকম তাদের ভাষা, কত রকম খাদ্যাভ্যাস, কত রকম পোশাক-আশাক। কত রকম সামাজিক আদব কায়দা উৎসব অনুষ্ঠান! ফলে চার্চের যাজকরা দুনিয়া সম্পর্কে যে ধারণা দেয় তার সাথে এই অভিজ্ঞতার অনেকটাই মেলে না।

ইতিমধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দী রজার বেকন এমন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, এমন কিছু কথা বলেছেন যা ধর্মশাস্ত্রে নেই। অসুখবিসুখ মহামারীর কারণ ‘শয়তানের কারসাজি’ নয়, প্রাকৃতিক — সেই কথা বলার অপরাধে যাজকতত্ত্বের কোপে পড়ে তাঁকে শেষ জীবন

কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। আসলে ধর্মীয় মতে শুধু ভগবান নয়, শয়তানের কাজেও খুত ধরা চলত না। ১৫৫৩ সালে জেনেভায় সার্ভেতাসের বিচার হয়েছে। অপরাধ শুরুতর। বাইবেল বলছে, যিশুর বিচরণভূমি জুডিয়া একটি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশ। কিন্তু নতুন ভৌগোলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে বাস্তব তথ্য দেখিয়ে সার্ভেতাস দাবি করেছেন — জায়গাটা নেহাতই শুষ্ক উষরভূমি। তলেমিরই লেখা একটি ভূগোল বই (Geographica) তিনি সম্পাদনাসহ পুনর্মুদ্রণ করে দেখাতে চাইলেন: “এই দ্যাখো, তোমরা তো তলেমিকে খুব শ্রদ্ধা করো। দ্যাখো, উনি এই সম্পর্কে কী লিখেছেন!”

কিন্তু ধর্মতত্ত্ব তখন তলেমির ভাস্তু জ্যোতির্বিদ্যা গ্রহণ করলেও তাঁর সঠিক ভূবিদ্যাকে পাঠ করতে আগ্রহী ছিল না। সুতরাং সার্ভেতাস চার্চের কোপে পড়লেন। শাস্তি সামান্য — আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড। আর এই দণ্ড কার্যকরী করার দায়িত্ব নিল — না, ক্যাথলিকরা নয়, জন ক্যালভিনের পরিচালিত প্রোটেস্টান্ট চার্চ!

তথাপি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা গির্জা বা মঠের বাইরে অন্যরকম সভাসমিতি করে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু করেছে। ক্রনোর নিজের দেশে নেপলসেই ১৫৬০ সালে গড়ে উঠেছিল Academia Secretorum Naturae। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য খ্রিস্টীয় যাজকতত্ত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে, আর, দু-চারটি ক্ষেত্রে এইসব সমিতির দু-একজন গুরুত্বপূর্ণ সভ্যকে উঁচুপদ বা সুযোগ সুবিধা দিয়ে (ধর্ম আর নৈতিকতা নাকি অবিভাজ্য!) এইসব প্রচেষ্টাকে ভেঙে দিচ্ছিল। আবিক্ষার হয়েছিল কিছু নতুন ভয়ঙ্কর শব্দ — নাস্তিক (atheist), অবিশ্বাসী (infidel), শাস্ত্রদ্রোহী (heretic), ধর্মবিদ্যে (blasphemy), ইত্যাদি। এই সব ছাপ গির্জার লোকেরা একবার কারো গায়ে সেঁটে দিলে তার বেঁচে থাকাই দুরহ হয়ে উঠত।

আসলে সেটা একটা সামাজিক টানাপোড়েন কাল — এক ঐতিহাসিক সঞ্চিক্ষণ! ইউরোপে যাকে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক যুগ বলা হয় তার তখন ধ্বংসকাল এগিয়ে আসছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই সামন্তী সমাজপতিদের সঙ্গে উদীয়মান ধনপতিদের বিরোধ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছিল। তখনকার ইউরোপের বড় বড় শহরের মধ্যবিস্ত শ্রেণি (burghers), যাদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালের বুর্জোয়াদের আবির্ভাব, এদের তখন বিজ্ঞান দরকার, সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্য দরকার, আর তার জন্য চাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি। আবার বিজ্ঞান যতটুকু এগোচ্ছিল, তাকে আশ্রয় করে যুক্তিবাদ তার থেকে কয়েক ধাপ বেশি এগিয়ে যাচ্ছিল — কোপার্নিকাস থেকে ক্রনোতে উত্তরণই তার প্রমাণ। তার ফলেই রাজার শাসন, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার, জমিদারি প্রথা, ভূমিদাস প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও মানুষ যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল (পাশ্চটীকা-২ দ্রষ্টব্য)।

রাজতত্ত্ব আর যাজকতত্ত্ব পৃথিবীর সব দেশেই তখন একে অপরের দোসর। কম-বেশি দু-হাজার বছরের আল্লীয়তা। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতাও তখনই এক হাজার বছরের বেশি পুরানো। তাই যাজকতত্ত্বের শিক্ষায়, বাইবেলের বাণীতে ভুল বেরলে, তা নিয়ে জনসাধারণ চর্চা করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত রাজতত্ত্বও আর নিরাপদে

পাঞ্চটীকা-২

ব্রহ্মের সময়কাল মহান সমাজবিজ্ঞানী এঙ্গেলসের রূপরেখায়

‘ইউরোপ যখন মধ্যযুগ থেকে উত্তীর্ণ হল, শহরে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণিই তখন তার বিপ্লবাত্মক চালিকা শক্তি। মধ্যযুগের সামষ্টী ব্যবস্থায় সে একটা স্বীকৃত অবস্থান আদায় করে নিলেও তার বিস্তারক্ষমতার তুলনায় সেটা ছিল খুবই ছোট। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুর্জোয়া হিসাবে বিকাশের পথে সামন্ততন্ত্র বাধা হয়ে পড়েছিল; ফলে সামন্ততন্ত্রকে বিদায় নিতে হল।

‘কিন্তু সামন্ততন্ত্রের একটা বিরাট আন্তর্জাতিক শক্তি ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এর দ্বারাই পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততন্ত্র আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রিক এবং অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে একটা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সমস্ত সামন্ততাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের গায়েই এ একটা পবিত্র দিব্যজ্যোতির ছাপ মেরে দিয়েছিল। এর নিজের সাংগঠনিক কাঠামোটিও গড়ে উঠেছিল সামন্ততাত্ত্বিক স্বরানুক্রমিক ঘড়েলে। আর তাছাড়া, এ নিজেই ছিল সমস্ত অর্থেই সবচেয়ে শক্তিশালী সামন্তপতি। কারণ এর দখলেই ছিল ক্যাথলিক দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ জমি। হীন সামন্ততন্ত্রকে এক একটি দেশে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে সফলভাবে আক্রমণ করার আগে, তার এই পবিত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনটিকে ধ্বংস করার দরকার হয়ে পড়েছিল।

‘তাছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যন্তরের সমান্তরালভাবেই বিজ্ঞানেরও ব্যাপক অগ্রগতি শুরু হয়ে গিয়েছিল; জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরতত্ত্ব নিয়ে আবার চৰ্চা শুরু হল। আর বুর্জোয়াদের শিল্প বিকাশের জন্য দরকার ছিল প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের ভৌত ধর্ম এবং বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক শক্তির কার্যকলাপ ঠিক ঠিক বোঝার মতো একটা বিজ্ঞান। এদিকে তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিল চার্চের হাতের পুতুল, ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে সে এক পাও ফেলতে পারত না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সে বিজ্ঞান হয়ে উঠতেই পারছিল না। বিজ্ঞান চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল; বুর্জোয়াদের বিজ্ঞানকে ছাড়া চলছিল না, তাই তারাও এই বিদ্রোহে যোগদান করতে বাধ্য হল।’ [F. Engels — Socialism: Utopian and Scientific; Foreign Languages Press, Peking 1975; pp. 24-25]

এঙ্গেলস অবশ্য এও দেখান যে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে তার জায়গায় ধনতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করে ফেলার পর ক্ষমতাসীন ব্যবসায়ীরা আর ধর্মের বিরোধিতা করতে চায়নি। বরং তখন তারাও ধর্মকে ব্যবহার করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ বুর্জোয়াদের প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি আসলে সমস্ত দেশের সম্পর্কেই খাটে।

‘সওদাগর বা ক্ষুদ্র কলমালিক নিজেকে তখন প্রভু হিসাবে ভাবতে লাগল, বা পুরানো রীতি মেনে, তাদের কেরানিকুল, শ্রমিক বা ঘরের চাকরবাকরদের তুলনায় ‘অভিজাত বংশীয়’ বলে মনে করত। সে তখন এদের কাছ থেকে যত বেশি এবং যতটা ভালো সন্তুষ্ট কাজ পেতে চাইত; তার জন্য তাদের মধ্যে দাস্যভাবের জন্ম দেওয়ার দরকার হত। সে নিজে তখন ধর্মভিরুৎ; তার ধর্ম* তাকে রাজা জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়ার মন্ত্র যুগিয়েছে; তার এটা আবিষ্কার করে ফেলতে দেরি হল না — এই ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সে তার অধস্তনদের চেতনার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যাতে তারা দ্বিতীয়ের ইচ্ছায় তাদের মাথার উপর যে নতুন প্রভু চেপে বসেছে তার হৃকুমগুলি মাথা নিচু করে পালন করে যাবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইংরেজ বুর্জোয়াদের এখন একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল দেশের নিচুশ্রেণির লোকগুলোকে, উৎপাদক জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা, আর তার জন্য একটা যে উপায় তারা কাজে লাগাতে পারল তা হল ধর্মের প্রভাব।’ (Ibid, p. 29)

সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় এঙ্গেলসের এই দুই পর্যায়ের বক্তব্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

* প্রোটেস্টান্ট মতবাদ — লেখক

থাকতে পারবে না। রাজারা সব নাকি ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিনিধি। ঈশ্বর নিয়েই যদি প্রশ্ন উঠতে থাকে তাহলে রাজার অস্তিত্ব নিয়ে, রাজতন্ত্রের যৌক্তিকতা নিয়ে আরও বেশি প্রশ্ন উঠবে। তাই উভয় পক্ষই খুব ছশ্মিয়ার। তার উপর আবার ইউরোপের প্রায় সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তখন হয় সরাসরি গির্জার অধীন অথবা বড় বড় বিশপদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে চলত। আর মহামান্য পোপের অধীন রোমান ক্যাথলিক চার্চ তখন সারা পশ্চিম ইউরোপেই তার নিশ্চিদ্র জাল বিস্তার করে রেখেছিল। ফলে ইতিহাসে বাতিল হয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ‘মহান’ দায়িত্ব নিয়েই পবিত্র ধর্মতন্ত্র তখন নব উদীয়মান বিজ্ঞানের রাশ টেনে ধরতে চেষ্টা করেছিল। নতুন যুগের প্রতিনিধি, নতুন মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের বৈতালিক, সত্যসাধক জিওর্দানো ক্রনো সেই কর্তৃত্বকেই চালেঞ্জ করে বসেছিলেন। এ প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার সামিল!

[९]

কুনো ভাবলেন, জার্মানি সুইডেন সুইজারল্যান্ডে যেহেতু রোমান ক্যাথলিকদের দাপ্ত
অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, প্রোটেস্টান্টরাই সেখানে প্রধান শক্তি, এইসব দেশে গেলে হয়ত
তিনি একটু নিশ্চিন্তে নিষ্পাস ফেলতে পারবেন। সার্ভেতাসের হত্যাকাণ্ড যে ক্যালভিনপস্থী
প্রোটেস্টান্টরাই করেছিল — এটা বোধ হয় তিনি খেয়াল করেননি। কিংবা এও হতে পারে
যে নিজে ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায়, ধর্মাত্মাই যে তখন গেঁড়ামি ও মতান্ধকার পচা পাঁকে
নিমজ্জিত — এ সত্য তাঁর তখনও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু জেনেভায় পা দিয়েই
তিনি দেখলেন, প্রোটেস্টান্টপস্থীরাও তাঁর বন্ধু নন। কারণ, প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংক্ষার
আদোলনের নায়ক মার্টিন লুথার ইতিমধ্যেই কোপার্নিকাসের মতবাদ সম্পর্কে তাঁর সুচিস্তিত
মতান্ধক জানিয়ে রেখেছেন: “লোকেরা একজন জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে শুনছে যে তিনি
দেখাতে চেষ্টা করেছেন — পৃথিবী ঘূরছে। স্বর্গ বা আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ঘূরছে না। যারাই
বুদ্ধিমান সাজতে চায়, তারাই একটা করে নতুন তত্ত্ব আমদানি করে। আর বলে, এটাই
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। এই মৃত লোকটা গোটা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই উল্টে দিতে চায়। অথচ
পরিত্র ধর্মগ্রন্থে আমরা পড়েছি, জোশুয়া সূর্যকেই থামতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পৃথিবীকে
নয়।”^৪ লুথার ভক্ত এক অধ্যাপক তখনকার দিনের সবচেয়ে অকাট্য যুক্তিটাই তুলে
ধরেছিলেন, “The eyes are witnesses that the heavens revolve in the
space of twenty four hours,”^৫ ইত্যাদি। ফলে জেনেভায় পা দিতেই ওখানকার
কর্তারা জানালেন, সেখানে থাকতে গেলে তাঁকে প্রোটেস্টান্ট মত গ্রহণ করতে হবে এবং
ক্যালভিনীয় গির্জায় যোগ দিতে হবে। তাছাড়া, কোপার্নিকাস তত্ত্ব প্রচার করাও একদম
বন্ধ করতে হবে।

মনের দুঃখে ভ্রমো গেলেন ফ্রান্সে, ক্যাথলিকদের দাপট তখন সেখানে একটু কম। সেখানে লিয় (Lyons), তুলুজ (Toulouse), মঁতপলিয় (Montpellier) এবং পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি দু বছর দর্শনে অধ্যাপনা করলেন। তারপর রাজদরবারে একটা সাধারণ পদে যোগ দিয়ে আরও তিনি বছর অতিবাহিত করলেন। সেখান থেকে ফরাসি

রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে তিনি ১৫৮৩ সালে দুবছরের জন্য ইংলণ্ড চলে যান। সেখানেও বিভিন্ন কলেজে তিনি দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা করেন। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ইংলণ্ডেই তিনো খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলেন। এই সময় ১৫৮৪ সালে তিনি ইতালী ভাষায় ক্রনো খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলেন। এই সময় ১৫৮৪ সালে তিনি ইতালী ভাষায় সংলাপের ঢং-এ অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করলেন; (১) *Cena de la Ceneri*; (২) *De la causa, principio e Uno*; (৩) *Del Infinito universo e Mondi*; (৪) *Spaccio de la bestia trionfante*; ইত্যাদি। এই সমস্ত বইতে তিনি শুধু যে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন তাই নয়, এমন কিছু কিছু নতুন কথা বললেন যেগুলো পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের দরবারে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তিনি ‘অসীম বিশ্ব’ বইতে বললেন, “It has seemed to me unworthy of the divine goodness and power to create a finite world, when able to produce beside it another and others without end; so that I have declared that there are endless particular worlds similar to this earth...”^৫ তারপর তিনি ঘোষণা করলেন এক যুগান্তকারী গাণিতিক বোধ সম্পৃক্ত দাশনিক সিদ্ধান্ত: “As the universe is infinite, nobody can properly be said to be in the centre of the universe or at the frontier thereof.”^৬ গ্রিক দাশনিক দেমোক্রিতাস, এপিকুরিয়াসের মতবাদ অনুসরণ করে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুকে এক আদি একক সচেতন সত্তা (monad) থেকে উদ্ভৃত বলে তিনি এমন এক ব্যাখ্যা হাজির করলেন যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে: “The infinity of forms under which matter appears, it does not receive from another and something external, but produces them from itself and engenders them from its bosom... Therefore, matter is not without form — nay, it contains them all and since it unfolds, carries them concealed within itself, it is in the truth all nature and the mother of all living things.”^৭

আবার সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রই যেহেতু একই রকম মোনাড দিয়ে তৈরি তাই পৃথিবীর বস্তুগুলি পার্থিব (terrestrial) এবং আকাশের বস্তুগুলি স্বর্গীয় (celestial) — এরকম ভাগাভাগি করার কোনো যুক্তি নেই।^৮

সংক্ষেপে তাঁর বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি এইরকম : (ক) বিশ্বজগৎ অসীম ও অনন্ত, তাই কে তার কেন্দ্র, কোথায় তার প্রান্ত — এসব বলার কোনো অর্থ নেই; (খ) সূর্য একটি নক্ষত্র, এর চতুর্দিকে আবর্তনরত গ্রহগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সৌরজগৎ; (গ) অন্যান্য নক্ষত্রগুলিরও সূর্যের মতো গ্রহপরিবার থাকতে পারে; (ঘ) গ্রহ এবং নক্ষত্র — সকলেরই দূরকম গতি রয়েছে; অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন ও কক্ষ পথে ঘূর্ণন; (ঙ) গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল, ইত্যাদি।

এহ বাহ্য!

ক্রনো খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের অনেকগুলি অলৌকিক মৌল ধারণাকে বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করতে বললেন। তাঁর মতে — কুমারী অবস্থায় তথাকথিত ‘পবিত্র আত্মা’র

প্রভাবে মেরির গর্ভে যিশুর আবির্ভাব সন্তুষ্ট হতে পারে না। প্রাচীনকালে মানব সন্তান যিশু-র উপর দৈবী মাহাত্ম্য চাপাতে গিয়ে সরল বিশ্বাসে মানুষ সেদিন এসব কাহিনির জন্ম দিয়েছিল। এখন আমাদের বুঝতে হবে, অন্য সব মানব সন্তানের জন্ম যেভাবে হয় যিশুর জন্মও সেভাবেই হয়েছে। যিশুর মহাত্ম্য জন্মের অলৌকিকতায় নয়, লৌকিক মহান কর্ম। আবার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনার্থে পল্লবিত কবরের উপর যিশুর পবিত্র আত্মার পুনরুত্থান (resurrection) কাহিনিও সত্য হতে পারে না বলে তিনি প্রচার করতে লাগলেন।

তার *De triplici minimo et mensura* প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করলেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মূল মর্মবাণী: “যিনি জ্ঞানচর্চা করতে চান তাঁকে প্রথমে সবকিছুতে সংশয় প্রকাশ করতে হবে। কোনো বিষয়ে বিভিন্ন মতামত শোনার আগে এবং পক্ষে ও বিপক্ষে উত্থাপিত যুক্তিগুলি দেখে শুনে বিবেচনা করার আগে তিনি ওই বিতর্কে কোনো মত দেবেন না। কানাঘুঁষোয় কী শোনা গেছে, অধিকাংশ লোক কী বলছে, বা যে বলছে তার বয়স, বিদ্যা বা সামাজিক প্রতিপত্তি কেমন, তার ভিত্তিতে কোনো মতামত বিচার বা গ্রহণ করবেন না। যুক্তি দিয়ে যে সত্য যাচাই করা যায়, বাস্তব জগতের সঙ্গে যে চিন্তাধারা মেলে, তিনি তার ভিত্তিতে অগ্রসর হবেন।”^{১০}

আজ থেকে চারশ বছরেরও আগে একজন পলাতক ভ্রাম্যমান চিন্তানায়কের মুখে উচ্চারিত বা কলমে নিঃসৃত এসব কথা শুনে আজও আমাদের চমকে উঠতে হয়।

চমকে উঠেছিল যাজকতন্ত্রও! স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বলে যদি কিছু আলাদা না করা যায় তাহলে ভগবান থাকবে কোথায়? নরকের অধিষ্ঠানই বা কোথায় হবে? আর নরকের ভয় না থাকলে আম জনতা পাদ্রিদের দাপট মানবে কেন? আবার বলে কিনা — আরিস্তল, তলেমি, অ্যাকুইনাস, কাউকেই নিজে যাচাই না করে মানবে না? এই ধর্মদ্বেষীর বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা আর না করলেই নয়। এবং ব্যবস্থা যা হল তা একমাত্র ধর্মীয় নৈতিকতাতেই বোঝা সন্তুষ্ট!

[8]

ইংল্যান্ডের আবহাওয়াও তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ত্রিশ সালে ফিরে গেলেন পারিতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর চলে গেলেন ভিটেনবার্গ, জার্মানিতে (১৫৮৬); তারপর প্রাগ (১৫৮৮), হেল্মস্টাট (১৫৯০) হয়ে আবার জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে (১৫৯১)। কিন্তু কোথাও তখন তিনি টিকতে পারছেন না। পারতেন যদি চুপ করে থাকতে পারতেন। সে তো তাঁর ধাতে নেই। পারিতে ১৫৮৫ সালে লিখলেন *De gli eroici furori*। ১৫৮৬ সালে ভিটেনবার্গে এসে আরিস্তলের মতবাদের বিরুদ্ধে ১২০টি প্রস্তাব বিশিষ্ট এক প্রবন্ধ লিখে বসলেন *Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus Peripateticos* (লাতিন)। ফ্রাঙ্কফুর্টে বসে লাতিন ভাষায় কবিতার ঢং-এ লিখলেন আরও তিন খানা বিশ্বতন্ত্রের বই। ফলে তাড়া খেয়ে এদেশ ওদেশ করে বেড়াতে লাগলেন।

অবশ্যে ১৫৯১ সালে ইতালির এক সন্ন্যাসী রাজপরিবারের যুবক — জিওভানি মোসেনিগো — ক্রনোর কাছে একখানা চিঠি লিখে পাঠাল। সে ক্রনোর ছাত্র হতে চায়। পড়ানোর বিনিময়ে সে যথেষ্ট অর্থ দেবে। এবং সবচেয়ে যেটা তখন বড় কথা গির্জার রোষ থেকে সে ক্রনোকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। চোদ্দ বছর ধরে দেশ ছাড়া ক্রনো তখন পলাতক জীবনে হাঁফিয়ে উঠেছেন। দেশের মাটিতে পা রাখার জন্যও মনে অস্থির ব্যাকুলতা। সহজেই তিনি ফাঁদে পড়ে গেলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে চলে এলেন প্রথমে পাদুয়ায়, তারপর ভেনিসে। মোসেনিগোকে নতুন বিশ্বতত্ত্ব পড়াতে শুরু করে দিলেন নিশ্চিন্তে। তারপর একদিন যথাসাধ্যত্ব ওরা এল — পোপের যাজকবাহিনী এবং সন্দাটের কোতোয়াল বাহিনী। বন্দি করে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল ধর্মীয় বিচারসভার (Inquisition) কাছে। শুরু হল বিচারের নাটক।

ক্রনোর বিরুদ্ধে পোপত্বের অভিযোগ অনেক। একশ ত্রিশটি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সবচাইতে গুরুতর অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু তাঁর ইতালীতে লেখা পুস্তিকা Spaccio de la bestia trionfante (জয়ী পশুদের বিতাড়ন)। যেখানে নাম ভূমিকায় মহামান্য পোপকে রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে চার্চের মতান্ধ লোকেদের না আছে ধর্মবিশ্বাস না আছে নৈতিক চরিত্র! এরকম যাঁর কাণ্ডকারখানা তাঁর বিরুদ্ধে বিচারের ফল কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আজীবন জেল হয়ে গেল তাঁর। রোমের ভ্যাটিকান প্রাসাদ সংলগ্ন ‘পবিত্র দণ্ড’ (Holy Office)-এর কারাগারে। তাঁর জন্য বরাদ্দ কামরাটিও সুন্দরভাবে তৈরি করা হল। আলোবাতাসহীন বন্দ প্রকোষ্ঠের মাথায় সীসার ছাদ। গ্রীষ্মে ঘরটা হয়ে উঠত একটা গরম চুম্বি। আর শীতকালে সাইবেরিয়ার কাঠের ঝুপড়ির মতো। সঙ্গে প্রতিদিন সামান্য খাদ্য ও জল এবং প্রচুর পরিমাণে দৈহিক নির্যাতন।

মাঝে মাঝে বিচারকদের নির্দেশ আসত — “ভুল স্বীকার কর, ক্ষমা প্রার্থনা কর। জীবন ফিরে পাবে। ইঞ্চির করণাময়।” ক্রনো কিন্তু নির্বিকার। সত্যের উপলব্ধি তাঁকে দিয়েছে সমস্ত অত্যাচার সহ করবার এক অপরিসীম মানসিক শক্তি।

১৫৯৩ সাল থেকে সাত বছর ধরে একটানা অত্যাচার চালিয়েও ক্রনোকে টলানো গেল না। কোনোভাবেই তিনি মাথা নত করলেন না। অবশ্যে ১৬০০ সালের জানুয়ারি মাসে ধর্মীয় বিচারসভা আবার মিলিত হল। এবার তারা সিদ্ধান্ত নিল — এই দুবিনীত অবিশ্বাসীকে চরমতম শাস্তি দিতে হবে। বাইবেলের নির্দেশ অনুযায়ী “যতদূর সম্ভব আরামদায়কভাবে এবং বিনা রক্তপাতে” (with possible clemency, and without shedding blood):^{১২} মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ, জীবন্ত অবস্থায় বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা।

৮ই ফেব্রুয়ারি ক্রনোকে যখন কারাগার থেকে বের করে আনা হল এবং বিচারকের রায় পাঠ করে শোনানো হল তিনি অতি কষ্টে একটুখানি হেসে বিচারকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “Perhaps you who condemn me are in greater fear than I who am condemned.”^{১৩}

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬০০।

ক্রনোকে রোমের বধ্যভূমিতে (ক্যাম্পো দেই ফিওরি — যেখানে অভিযুক্তকে আগুনে পোড়ানো হত) একটি মঞ্চের উপর শিকলে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মুখের ভেতরে তাঁর জিহ্বাও তার দিয়ে বাঁধা। যাতে মরণ যন্ত্রণায় আর্তচিংকারণ না করতে পারেন। অথবা, শেষ মুহূর্তেও যাতে বধ্যভূমির দর্শকদের কাছে বিজ্ঞানের কথাটা না বলে ফেলেন। অত্যন্ত উন্নত মর্যাদাবোধ ও সত্যনিষ্ঠার এক জুলন্ত পরিচয় দিয়ে বীরের মতো শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন জিওর্দানো ক্রনো।

ক্রনোর নামোচ্চারণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্র করে দিল যাজকতন্ত্র। তাঁর বইপত্র যেখানে যা পাওয়া গেল খুঁজে বের করে এনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হল। চেষ্টা শুরু হল ক্রনোর সম্পর্কে যেন কোনো তথ্যই ইতিহাসে না থাকে।

তা সত্ত্বেও ইতিহাসে ক্রনো বেঁচে রইলেন। সত্যসন্ধি বিজ্ঞানীরাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন। তাঁরই সমসাময়িক এক ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্ট ছিলেন ইংলণ্ডের রাণি এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনিই চুম্বক ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এবং *De Magnete* নামক এতদসংক্রান্ত প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থটি লিখেছিলেন। ১৬০০ সালেই এটা প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছিল ক্রনোর বিশ্বতন্ত্র। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লেখা আর একখানা বইয়ের পাশুলিপি পাওয়া যায়, যা ১৬৫১ সালে প্রকাশিত হয় *On Our Sublunary World, A New Philosophy* নামে। এতে গিলবার্ট ক্রনোর নামোন্নেখ সহযোগেই তাঁর মতবাদ বিশদভাবে আলোচনা করে রেখে যান।

আমরা এও জানি, ক্রনোর জীবনকালেই ইতালিতে বিজ্ঞানের মঞ্চে এসে গিয়েছিলেন গ্যালিলেও গ্যালিলি। তিনি পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও গাণিতিক পদ্ধতিতে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহ সম্পর্কে টেলিস্কোপের সাহায্যে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন ও পদার্থবিজ্ঞানের জন্ম দিলেন। একই সময়ে কেপলারের সূর্যের চারদিকে গ্রহদের ঘূর্ণনসংক্রান্ত তত্ত্ব সম্বলিত বিখ্যাত *Astronomia Nova* বইটি যা তিনি লিখেছিলেন তাঁর শিক্ষক ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ টাইকে ব্রাহ্মের দিয়ে যাওয়া দীর্ঘ তিরিশ বছরের খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণের বিপুল তথ্যভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে। এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের কাছে একটা স্পষ্ট ছবি উঠে এল। খ্রিস্টীয় যাজকতন্ত্র গ্যালিলেওকেও রেহাই দেয়নি; নির্যাতন করেছে, চূড়ান্তভাবে অপমান-লাঞ্ছনা



উইলিয়াম গিলবার্ট
(১৫৪০ - ১৬০৩)



টাইকো ব্রাহে
(১৫৪৬ - ১৬০১)

দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রনোর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রতিপন্থ হল — “বিজয়ী পশুদের” জয় স্থায়ী হল না, বিজ্ঞান ও সত্যের জয় হল। ধর্মীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বিজ্ঞানের সপক্ষে যাজক পাদ্রিদের সমস্ত আপত্তি অগ্রহ্য করে ইতালির যুক্তিবাদী জনসাধারণ উনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদে নোলাতে এবং রোমের সেই কৃখ্যাত বধ্যভূমিতেই (দ্বিতীয় প্রচন্দ দ্রষ্টব্য) স্থাপন করেছেন ব্রনোর দুটি পূর্ণসঙ্গ মৃতি। জেমস জিন্সের ভাষায়, “In this and similar ways the spirit of Bruno lived on, and in its own time produced even greater changes in thought than the hypotheses of Copernicus.”^{১৩}

[৬]

ব্রনোর শহীদত্ব বরণের পরে চারশ বছর কেটে গেছে। বিজ্ঞান তারপর অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং বিকশিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে ব্রনোর কথাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যা-ই হোক, প্রামাণ্য জ্ঞান হিসাবে আজ আর কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা দেওয়ার মতো শাসকীয় ক্ষমতাও অনেকদিন আগেই ধর্ম হারিয়েছে। যুক্তিবাদ বিজ্ঞানমনস্তা আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব প্রশ্ন উঠতেই পারে, এতদিন পরে ব্রনোকে স্মরণ করার, চর্চা করার, বিশদভাবে আলোচনা করার আজ আর কোনো প্রয়োজন বা প্রসঙ্গ আছে কিনা।

আছে। খুবই আছে।

আমাদের দেশের প্রসঙ্গে তো খুবই বেশি করে আছে।

আমাদের দেশেরই এক মহান বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্যালিলেও সম্পর্কে লেখা একটা ছোট প্রবন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটা কথা বলেছিলেন: ‘‘সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরূপ করার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি। ফলে ইতালী দেশই পেছিয়ে পড়ল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করল।’’^{১৪}

কথাটা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। ইতালিতেই প্রথম নবজাগরণের সুগাম সঙ্গীত বেজে উঠেছিল। জন্ম নিয়েছিলেন সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে পেত্রার্ক, বোকাচিও, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ব্রনো, গ্যালিলেও, তরিসেলি’র মতো অসংখ্য বহুমুখী শিখরচুম্বী মনীয়া। একের পর এক। অথচ ধর্মতন্ত্রের দাপটে বিজ্ঞানের সত্যকে বিরোধিতা করতে গিয়ে, সত্যের পূজারীদের শৃঙ্খলিত করতে গিয়ে সেই দেশ জ্ঞানে বিজ্ঞানে অথনীতিতে শিল্পবিকাশে ইংলণ্ড ফ্রান্স হল্যান্ড জার্মানি বেলজিয়ামের তুলনায় ধীরে ধীরে অনেক পেছনে পড়ে গেল। রেনেশান্সের সোনার ফসল অস্তত দুশ বছরের জন্য ইতালির হাতছাড়া হয়ে গেল।

আমাদের দেশে ইতিহাসের এই শিক্ষাটা অনেকেই বুঝতে পারেনি। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানচর্চায় ধর্মকে সজ্ঞানে বাদ দিয়ে চলার মতো ধর্মনিষ্পত্তি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গ এদেশে গৃহীতই হয় নি। আর ইদানিংকালে তো সরস্বতীবন্দনা, দেশমাতৃপূজা, বৈদিক গণিত — নানা নামে বেনামে ধর্মীয় অঙ্ক বিশ্বাসগুলিকে জবরদস্তি শিক্ষার প্রক্রিয়ায় গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যারা জীবনে কোনোদিন সরস্বতী পূজা করেনি সেই সব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রযুক্তিক্ষেত্রে অবদানের পরিমাণগত তুলনা করলে বরং দেখা যায় — সরস্বতী বন্দনার সাথে সারস্বত সাধনার যেন সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ বা ব্যাতানুপাতিক সম্পর্ক। অথচ শ্রেফ ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে এই তথ্যগুলিকে ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যদি সময় থাকতে আমরা সাবধান না হতে পারি তাহলে আমাদের জন্যও অপেক্ষা করে থাকবে গ্যালিলেও-উন্নত ইতালির ভবিতব্য।

এখানে আরও একটা তথ্য সকলের গোচরে আনা দরকার। সার্ভেতাস ক্রনো প্রমুখকে পুড়িয়ে মারা, গ্যালিলেওকে নির্যাতন ও হেনস্তা করার ফলে খ্রিস্টীয় গির্জার মর্যাদা বিশ্বের দরবারে অনেকটাই নীচে নেমে যায়। হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবীরা এক নতুন গবেষণায় হাত লাগান। যাতে ক্রনোর চরিত্র ও বুদ্ধিতে কিছুটা কালির দাগ ফেলা যায়। ক্রনো নাকি মিশরীয় প্রাচীন গুপ্তবিদ্যা শিখে মানুষকে যাদু দেখিয়ে মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত করতেন, তিনি নাকি চার্চ ও মহামান্য পোপকে খুব গালাগাল করতেন, ইত্যাদি। প্রথমত কথাগুলো সত্য নয়; দ্বিতীয়ত, যদি সত্য হতও, তথাপি তার জন্য তাঁকে ইত্যাদি। প্রথমত কথাগুলো সত্য নয়; দ্বিতীয়ত, যদি সত্য হতও, তথাপি তার জন্য তাঁকে ন্যায়সম্পত্ত হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, এটাও মনে রাখতে হবে, ক্যাথলিক চার্চ গ্যালিলেওর ব্যাপারে ভুল স্বীকার করলেও ক্রনোর ব্যাপারে আজ অবধি ভুল স্বীকার বা দুঃখ প্রকাশ করেনি। বরং ক্রনো সম্পর্কে তাদের ক্ষেত্রের কারণটা — এবং সেটা এখনও জীবন্ত — বোঝা যায় একটি মন্তব্য থেকে: "... his system of thought is an incoherent materialistic pantheism. ... His attitude towards religious truth was that of a rationalist. Personally, he failed to feel any of the vital significance of Christianity as a religious system."^{১৪} ক্রনোর চিন্তাধারার সাথে সনাতন ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য ও আধুনিক যুক্তিবাদী মননের নৈকট্যই এই সত্ত্বিক উভার কারণ!

শুধু এটুকু বললেও হবে না। আসলে বিজ্ঞানচিন্তার বিরুদ্ধে ধর্মকে আজ শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে — কোথাও খ্রিস্টধর্ম, কোথাও ইসলাম, কোথাও হিন্দুধর্ম। কিন্তু সর্বত্রই সে ধর্ম, বক্তব্য তার একই — ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান নিয়ে চল। মেশিন বানাও এবং চালাও, মারণাত্মক তৈরি কর, খনিজ সম্পদ জৈর সম্পদ নিয়ে চল। মেশিন বানাও এবং চালাও, মারণাত্মক তৈরি কর, খনিজ সম্পদ জৈর সম্পদ নিয়ে চল। আসলে এই কিন্তু চিন্তার জগতে যেন বিজ্ঞান না ঢেকে। সেখানে ঈশ্বর, নিঃশেষ কর, আপত্তি নেই; কিন্তু চিন্তার জগতে যেন বিজ্ঞান না ঢেকে। বড় ব্যবসায়ী, কিংবা, মাদুলি, আংটি, লাল সুতো, টিয়া পাথি — এরাই চেপে বসে থাক। বড় ব্যবসায়ী, একচেটিয়া মালিক, বহুজাতিক সংঘ, ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্র — সকলেই ধর্মকে এখন আর শুধু

আফিং-এর মতো বিমানো মাদক হিসাবে নয়, ডোপ করার মতো তাতানো মাদক হিসাবে চাগিয়ে তুলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার পাঠ্য বিষয়ের মধ্য দিয়েও যুক্তি বিরোধী ধ্যানধারণা ও বহু অসত্য প্রচার করা হচ্ছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর উচ্চত দেশগুলিতেও ।^{১৫} সরকারী ক্ষমতায় যারা বসে আছে, সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি-র মালিক যারা — সকলেই এই ব্যাপারে কম-বেশি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ এই ব্যাপারে উদাসীন বা চুপচাপ। কিন্তু যাঁরা সরব হতে চাইছেন তাঁদেরও লিখতে বা বলতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ধর্মকে সমর্থন করে লিখলে আজে বাজে লেখাও প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় বেরিয়ে যাবে। ধর্মকে বিরোধিতা করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে উপজীব্য করলে নানা অজুহাতে সেইসব প্রবন্ধকে চেপে দেওয়া হবে। বেতার বা টিভি অনুষ্ঠানের বক্তা নির্বাচনেও একই রকম মাপকাঠি। এমনকি লোকস্থিয় বিজ্ঞানের বই প্রকাশনার জগতেও একই ঘটনা ঘটছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য একটাই। সাধারণ মানুষ যখন দেখবে কিছু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ধর্মের পক্ষে ওকালতি করছেন, তারা মনে করবে, সত্যিই বুঝি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই। কারণ, তারা জানতেই পারছে না যে আর একদল একই রকম লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ধর্মবিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবেই যুক্তিবিরোধী ও অনৈতিক বলে মনে করেন। অর্থাৎ, আজকের দিনে ত্রিনো গ্যালিলেওদের দৈহিক আঘাত না করেও গণমাধ্যমের স্পষ্ট পক্ষপাতিত্বের আড়ালে তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই ঘটনাই ঘটছে আজ যুক্তরাষ্ট্রে, ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানিতে, জাপানে কিংবা ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে এই বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করে একজন বিশিষ্ট গ্যালিলেও-গবেষক খুব উদ্বিগ্ন ভাষায় বলেছিলেন: “[Recent] events have created a new alarm concerning the unchecked progress of scientific knowledge. This time it is not the church but the state which feels morally obliged to impose external limitations upon the freedom of scientific inquiry and the communication of knowledge and opinion.”^{১৬} বিগত পঞ্চাশ বছরে এই প্রবণতা কমা তো দূরের কথা, আরও বেড়ে চলেছে।

বিজ্ঞানের উপর, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর, যুক্তিবাদের উপর এই যে বিশ্বব্যাপী আক্রমণ চলছে এই পরিস্থিতিতে ত্রিনোর জীবন সংগ্রাম, সেই সময়কার ইতিহাস আজ আবার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শ্মরণ ও চৰ্চা করা দরকার। তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রেরণা নেওয়া দরকার। ■

সূত্রাবলী :

- ১। উদ্ভৃত, A. D. White — A History of the Warfare of Science with Theology; Vol. 1; Dover, New York; 1960; p. 124
- ২। উদ্ভৃত, Mansel Davies — An Outline of the Development of Science; Bombay 1959; p. 43
- ৩। উদ্ভৃত, White — op. cit., p. 117
- ৪। ঐ, Ibid, p. 126; দ্রষ্টব্য, বাইবেল, জোশয়া ১০/১২-১৩
- ৫। ঐ, Ibid, pp. 126-27
- ৬। উদ্ভৃত, James Jeans — The Growth of Physical Science; Cambridge University Press, Cambridge; 1947; p. 139
- ৭। ঐ, Ibid
- ৮। উদ্ভৃত, M. N. Roy — From Savagery to Civilisation; Renaissance Publishers, Bombay; 1943; pp. 62-63
- ৯। উদ্ভৃত, Jeans — op. cit., p. 140
- ১০। উদ্ভৃত, Frank Gaglioti — “A man of insight and courage: Giordano Bruno, philosopher and scientist”; World Socialist Website,
- ১১। উদ্ভৃত, Jeans — op. cit., p. 140
- ১২। ঐ, Ibid
- ১৩। Ibid, p. 141
- ১৪। সত্যেন্দ্রনাথ বসু — “গালিলিও”; সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা; ১৯৯২, পৃঃ ১৭৫
- ১৫। দ্রষ্টব্য : “Bruno, Giordano”, in The Catholic Encyclopaedia, Vol. III; New York, 1999
- ১৬। James Harvey Robinson — The Mind in the Making; Watts and Co., London; 1934.
- ১৭। Stillman Drake (ed.) — Discoveries and Opinions of Galileo; Anchor Books, Doubleday, New York; 1957; “Introduction: First Part”, p. 6.

জিওর্দানো ব্রুনোর প্রধান (বিশ্বতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক) রচনা

- ১। Cena de la Ceneri ইতালী; লগুন ১৫৮৪ (ইংরাজি অনুবাদ: The Ash Wednesday Supper)
- ২। De la causa, principio e Uno; ঐ; ঐ; (Concerning cause, principles and the one)
- ৩। Del Infinito Universo e mondi; ঐ; ঐ; (The Infinite Universe and the Worlds)